রূপহলুদ

ননীবালা

ননীবালা মেয়েকে বল্লে, সুপুরি কুড়িয়ে আন তো কালী রায়ের গাছের তলা থেকে!

মেয়ে বল্লে—হ্যাঁ, খাণ্ডা পিসি দাঁড়িয়ে আছে, বলেছে এবার সুপুরি কুড়ুতে হ'লে পয়সা দিয়ে যেও। সুপুরি এমনি পাওয়া যায় না বাজারে।

ননীবালা এ গাঁয়েরই মেয়ে, তার রাগ হয়ে গেল খুব। কালী রায়ের বুড়ী দিদিকে ঘাটের পথে পেয়ে খুব করে শুনিয়ে দিলে।

বুড়ী বল্লে—তুমি ভাই অনর্থক তিলকে তাল কোরো না। সুপুরি কুড়ুতে এসেছিল সেদিন, সর্ব্বদা কুড়ুতে আসে, তাই বল্লাম আমাদেরও তো দরকার আছে, কেন আস রোজ রোজ?

—সর্ব্বদা কুড়ুতে যাবার দায় পড়েছে!

—রোজ আসে, আমি বলছি। তুমি ভাই জানো না।

—কে বল্লে রোজ যায়?

—আমি জানি। রোজ দেখি যেতে।

—আচ্ছা বেশ। এবার যায় যদি, পয়সা নিয়ে যাবে।

কালী রায়ের দিদি পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগলো—বড্ড গোমর হয়েছে ঐ ননীর। পয়সা দেখাতে আসে আমার কাছে! এমনি আদ্ধেক দিন হাঁড়ি চড়ে না, আবার পয়সার গোমর! ঝি-গিরি করে তো চালাচ্ছিস্—পয়সা দেখাতে লজ্জা করে না?

ননীর মেয়ের নাম নালু, ভালো নাম সরবালা। নালু এর গাছের লিচু, ওর গাছের কুমড়োর জালি, শশার জালি চুরি করে আনে। পাড়ার কারো গাছে এঁচোড় আর পাকবার জো নেই নালুর জন্যে।

ননী কিন্তু তা জানে না। খিদের জ্বালায় সরবালা যা চুরি করে, রাস্তাতেই তা খেয়ে ফেলে। বিকেলে কি ভীষণ খিদে পায়, কে দেয় একগাল চালভাজা? রায়েদের গাছে কি মাদার পেকে আছে! পাকা যেমনি, বড়ও তেমনি। ঠেলে উঠলো গাছে। রায়-ঠাকুরমা দেখে বল্লে—ও মা, গেছো মেয়েছেলে কখনো দেখিনি! তুই এমন গেছো হলি কবে? নাম নাম—

—দুটো মাদার পাড়চি ঠাকুমা—

—খেলেই জ্বর! কেন ওসব ছাই খাবি?

কেন সে খাবে সে-ই জানে। মা ও-পাড়ার দামারি কাকার বাড়ি গোয়াল পরিষ্কার করে ও বিচালি কেটে জল তুলে আটটা গরুকে জাব দেয়। এসব করতে সন্ধ্যে। সন্ধ্যের পর মা বাড়ি এসে ভাত রান্না করবে, তবে খেতে দেবে। পেট যে এখুনি জ্বলবে, তার কি? কি খাবে সে, ভেবে পায় না। শুধু সে নয়, পল্টু, হাবু, নন্তু, ননকু, রেপু, নেপু সবাই আসে।

ওদেরও বাড়িতে ওই অবস্থা। দুপুরে ভাত খাও, তারপর বিকেলে হাজার খিদে পাক না কেন, খাবার নেই। তবে সে একটু আসে ঘন ঘন। তার মা বাড়িতেই থাকে না যে। সে কি করবে? ওরা চাইলে পায়, তার তো চাইবার লোকই নেই। অথচ খিদে—কি ভীষণ খিদে! পেটের মধ্যে কেমন যেন কামড়ায় খিদের জ্বালায়।

রাত্রে নালুর জ্বর হ'ল।

ননী পড়ে গেল মুশকিলে। মেয়ের গা দেখলে পুড়ে যাচ্ছে। কি খেতে দেবে, রুগীর পথ্যি

কি আছে ঘরে? ডাক্তারই বা কোথায়? এক আছে সুরেন ডাক্তার। দু টাকার কম এ রাত্রে আসবে না। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখে বল্লে—যেমন তুমি তেমনি হয়েছে আমার অবস্থা। কি যে করি—

রাত্রে বড্ড জ্বরটা বাড়তে সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রীকে—ও জ্যাঠাইমা—জ্যাঠাইমা—ইদিকে একবার আসুন, খুকীর বড্ড জ্বর—

প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন ঘুম থেকে। অনেক রাত। দেখে বল্লেন—তাই তো, বড্ড জ্বরটা বেড়েছে। কুইলেনের বড়ি আছে আমার কাছে। কাল সকালে খাইয়ে দিও—

—দেখুন তো জ্যাঠাইমা, গরীবের ঘরে কি কাণ্ড—

—তাই তো বাপু। সবই অদেষ্ট তোমার। তোমার বাবা ভালো দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন। দোজবরে তাই কি? দিব্যি চেহারা। কলকাতায় বাসা। ইন্‌জিনিয়ার লোক। দু পয়সা আয় ছিলো, সইলো না তো কি হবে! অল্প বয়সে কপাল পুড়লো।

—সে তো একশোবার জ্যাঠাইমা। নইলে খুকীকে আজ দুটো পেট ভরে ভাত দিতে পারি নে! এ কি কম দুঃখু! পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি, তাতে আমার এ গাঁয়ে অপমান নেই। এ গাঁয়ের মেয়ে যখন আমি। বলুন—ঠিক কি না?

—সে কথা তো বটেই মা। তার আর কি হবে বলো। সবই অদেষ্ট। আমি গিয়ে কুইলেনের বড়ি নিয়ে আসচি—

—এখন দরকার নেই জ্যাঠাইমা, কাল সকালে পাঠাবেন।

—মা, রাতটা আজ এখানেই থাকবো?

—না জ্যাঠাইমা। আমি বেশ থাকবো এখন। আপনি মায়ের মত, তাই কথাটা বল্লেন। এ গাঁয়ে ও কথাও কেউ বলবে না।

ননীবালা সত্যিই পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে পাঁচ টাকা আর একবেলা ভাত পায় এক থালা। ভাত সে বাড়ি নিয়ে আসে। যে বাড়িতে কাজ করে, তারা ভাত দিতে কৃপণতা করে না, বড় বড় ধানের গোলা তাদের বাড়িতে পাঁচ-সাতটা, বাগান, পুকুর, জমিজমা সব আছে। মা আর মেয়ে সেই এক থালা ভাত খায়।

ননীবালার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার এক বড় ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে। দোজবরে পাত্র হোলে কি হবে, বেশ ছিলেন তিনি দেখতে শুনতে। বয়েসটা একটু বেশী ছিল, ননীবালা গিয়ে দেখেছিল তার বয়সের দুটি সৎমেয়ে আছে তার। সৎমেয়ে দুটি কোথায় থেকে পড়তো, বাড়িতে আসতো খুব কম। মাত্র দু বছর স্বামীর সঙ্গে সে তেতলার বাসায় কাটিয়েছিল পরম সুখে, এর মধ্যে বারকয়েক দেখা হয়েছিল সৎমেয়ে দুটির সঙ্গে।

বড় মেয়েটির বিয়ের সব ঠিকঠাক। সে সময়েই স্বামীর অসুখ করলো। বিয়েও হ'ল, মাসখানেকের মধ্যেই স্বামী মারা গেলেন। তারপর বড় মেয়ের স্বামী ছোট মেয়েটিকেও নিয়ে গেল সুদূর পশ্চিমে তার কর্ম্মস্থলে।

সৎশাশুড়ী একা বাসায়। ননীকে কেউ বল্লেও না সে কি করবে, কোথায় যাবে, কি খাবে। সরবালা তখন এক বছরের শিশু।

দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে, বড় সৎমেয়ে সুললিতা তার ছোট বোন সীমাকে নিয়ে উঠছে মোটরে স্বামীর সঙ্গে। ননীবালা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুললিতা কাছে এসে দাঁড়ালো। ননীর প্রায় সমবয়সী তার এই সৎমেয়েটি, বরং কিছু বড়। সীমাই ননীর সমবয়সী। সুললিতার পরনে দামী ভয়েলের শাড়ি, হাতে পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ।

ননীবালা বল্লে—এসো মা, সাবধানে থেকো। চিঠিপত্তর দিও।

ননীবালা পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে, নিজের কথা কিছু বলতে জানে না। সুললিতা বলেছিল একদিন তার স্বামীকে—ওর অভাব কি, বাবা সর্ব্বস্ব ওর পেটে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।

ননীবালার পেটরাতে নগদ বাইশ টাকা আছে। ঐ তার শেষ সম্বল। ভগবান জানেন।

ননীবালার গহনাগুলো সৎমেয়ে দুটি চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের সময়। বিশেষ করে সুললিতা। ওগুলো নাকি তার নিজের মায়ের গায়ের আদরের গয়না। ন্যায্যমত নাকি ওরই প্রাপ্য।

সুললিতা বেশী কিছু না বলেই বিদায় নিলে।

জামাই এসে প্রণাম করলে। এই লোকটিই প্রথম তার সঙ্গে কথা বল্লে যাবার সময়।

—মা, তাহলে আসি।

—এসো বাবা। চিঠি দিও।

—আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু। একা রইলেন এখানে। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে!

—তা তো বটেই।

—চিঠি দেবেন—

—তোমরা আগে দিও।

পেছন থেকে সুললিতা বলে উঠলো—ওগো, দেরি কোরো না। সাড়ে দশটা বাজে।

ননীবালা ফিরে এসে ঘরে ঢুকে মেয়েকে কোলে তুলে নিলে। বল্লে—খুকী, ওরা চলে গেল। আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল। কার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল রে? দেওয়ালে স্বামীর ফটোখানার দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটি বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়লো।

এর মাস দুই পরে মেয়েকে নিয়ে ননী বাপের বাড়ি চলে এসেছিলো এবং সেই থেকেই এখানে আছে।

আজ দশ বছর আগেকার কথা এসব।

সৎমেয়েরা কোনো চিঠিপত্র দেয় নি, কোনো খোঁজখবরও নেয় নি।

সরবালা সেরে উঠলো না। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় একটু একটু জ্বর হয়। না আছে ওষুধ, না আছে পথ্যি।

ননী যখন পরের বাড়ি কাজ করতে যায়, তখন সরবালা একাই বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকে। কোনোদিন জ্বর আসে, কোনোদিন আসে না। যেদিন ভালো থাকে, সেদিন কামার-বাড়ির হর আর মতি তার সঙ্গে কড়ি খেলতে আসে। যেদিন জ্বর আসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। একাই শুয়ে থাকে।

ননী কিন্তু খুব শক্ত মেয়েমানুষ। কিছুতেই সে দমে না। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সে বেটে কাটে রোজ। আগে বেটে কাটতে জানতো না, ক্রমে শিখে ফেললে। এক পোয়া থেকে দেড় পোয়া দড়ি কাটতো প্রথম প্রথম, ক্রমে এক সের পর্য্যন্ত কাটতে লাগলো। রাত দশটার মধ্যে এক সের দড়ি বেশ সরু করে কাটতে পারে। প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী একদিন এসে বল্লে, বেটে কাটছো মা? বেশ বেশ।

—শিখিচি জ্যাঠাইমা। কিছু আয় করা তো চাই।

—কোথায় শিখলি ?

—বাড়িতে। কে আবার শেখাবে। সন্নিসি কাকা বুড়ো বয়সে বেটে কাটতো। তার কাটা দেখেছিলাম অনেক দিন আগে। সেই থেকে শিখেছি।

সরবালার পা ফুললো, মুখ ফুললো, পুরনো ঘুষঘুষে জ্বর। বল্লে—এর একটা ব্যবস্থা কর, নইলে খারাপের দিকে যাবে।

ননী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে একদিন অন্তর যেতে লাগলো। ডাক্তার সাহেবকে বুঝিয়ে বল্লে মেয়ের রোগের ইতিহাস।

মাস দুই ধরে একদিন অন্তর কামাই করবার ফলে চাকুরি গেল ননীর। এক থালা ভাত আসে না, টাকা ক'টাও গেল। এমন হ'ল খাওয়া জোটে না। সরবালা সেরে উঠেছে একটু, কিন্তু খাবার অভাবে শুধু কাঁচা পেয়ারা খায় হিমি ঠাকরুণের পেয়ারাতলায় বসে বসে।

এর ওপর এক নতুন বিপদ বাধলো।

যাদের বাড়িতে ননী ঝি-গিরি করতো, কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তারা খুব চটে গেল। তাদের হাতে গ্রামের কনট্রোলের দোকানের কাপড় দেওয়ার ভার। তিন মাসের মধ্যে একখানা গামছাও তারা দিলে না ননীবালাকে। কত অনুনয় করেও তাদের মন গলানো-গেল না। বাইরে বেরুনো যায় না আর কাপড়ের অভাবে। তালির ওপর তালি লাগিয়ে যতদিন চালানো যায় চললো, আর চলে না এমন অবস্থায় এসে পৌঁছুলো।

বিকেল বেলা ননী মেয়েকে বল্লে,—হ্যাঁ রে, বেটের দড়ি কাটতে বসবি ?

—সন্ধ্যের সময় বসবো মা।

—তেল নেই, অন্ধকারে হবে না। এখন বোস। তবু আনা চারেক পয়সা হবে সকালবেলা।

—মা, একটা কথা শুনবে ? আমি ঢ্যাঁপের বীচি আনবো মাদ্‌লার বিল থেকে। তুমি ঢ্যাঁপের খই করতে জানো ?

—খুব জানি। তুই আনতে পারবি ? কার সঙ্গে যাবি সেখানে ? বিলের জলে কেউটে সাপের আড্ডা।

—বাগ্‌দি-বৌ যাবে আর আমি যাবো। বাগ্‌দি-বৌ বলছিল, ঢ্যাঁপের খই খেলে এক বেলা কেটে যাবে। রাত্রে আমরা ঢ্যাঁপের খই খাবো।

ননীর মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিল। তার আদরের মেয়ে আজ দুলে-বাগ্‌দিদের মেয়ের মত ঢ্যাঁপের খই খেয়ে রাত কাটানো খুশির ব্যাপার বলে মনে করছে।

মেয়েকে বল্লে,—নালু,—কাউকে বলিসনে যে ঢ্যাঁপ তুলতে যাবি। এ গাঁয়ে আবার ইদিকে নেই, ওদিকে আছে কি না।

সরবালা চলে গেল বাগ্‌দি-বৌ নীলার সঙ্গে।

ননী বল্লে,—ও নীলি, দেখিস্ দিদি, নালু যেন বেশী জলে যায় না। পদ্ম গাছে বড্ড সাপ থাকে।

সরবালার মন খুশিতে ভরে উঠলো। মাদ্‌লার মস্ত বড় বিল পদ্ম আর নালফুলের বনে ভরে আছে। নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে বিলের ওপর। যদিও বর্ষাকাল আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। শরতের আমেজ আছে রদ্দুরের গায়।

বিলের ধারে নল-খাগড়ার ঝোপে তিত্‌পল্লার ফুল ফুটেছে। বাগ্‌দি-বৌ বল্লে—নালু, করমচা খাবে মা ? আর এই ঝোপে কত করমচা আছে—

—খাবো খাবো। তবে নীলি একটা কথা। মাকে কিন্তু বল্লে খাবো না। করমচা খাওয়ার

কথা শুনলে মা বকবে। জ্বর হচ্ছিল কিছুদিন আগে।

—তবে খেও না মা। থাক গে।

—না খাবো। তুই তবে বল্লি কেন? আমি ঠিক খাবো—

এক মুঠো ডাঁশা করমচা চিবোতে চিবোতে নালু ও নীলি নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো। নালু তো অবাক। কত বড় বিলটা! কত পদ্ম ফুটে আছে। ওপারে ওরা কি করছে? মাছ ধরছে? কি মাছ? কই, মাগুর?

নালু ডাক দিয়ে বল্লে,—কি দর, ও জেলে কাকা?

—মাছ নেবা খুকী?

—দর বলো না।

—বাছা বাছা বিলির কই, তিন টাকা সের। আর মাগুর মাছ সাড়ে তিন টাকা।

দাম শুনে কিনবার বাসনা উবে গেল সরবালার। বাপ রে, মাসে মা মোটে পাঁচ টাকা মাইনে পেতো, আমি কিনবো তিন টাকা সেরে মাছ! সে পাঁচ টাকাও আজকাল আর পায় না!

হঠাৎ বাগ্‌দি-বৌ বল্লে,—নালু মা, মাছ ধরবো?

—তুমি?

—তুমি আর আমি। একজনের কাপড় খুলতে হবে। তুই ছেলেমানুষ, কাপড় খুলে ফেল।

—যাঃ!

—কে দেখছে? কোন লোক নেই এ দিগরে। বিল আর মাঠ।

নালুর কাপড় খুলে দিয়ে বাগ্‌দি-বৌ ওকে জলে নামালে। ছাঁকা দিয়ে দুজনে মাছ ধরতে লাগলো। পদ্ম গাছের তলায় আর শেওলার দামের মধ্যে। বৃথা পরিশ্রম। আধ ঘণ্টা জল-কাদা মাখাই সার হ'ল। সন্ধ্যা হবার দেরি নেই। বকের দল ছায়াভরা নীল আকাশের গা বেয়ে পাল্লার বড় বিলের দিকে চলেছে। বিলের উত্তর পাড়ে বন-জাম গাছের ডালে ডালে কালো বাদুর ঝুলছে। ঘুংরি পোকা ঘুর্‌-র্‌-র্‌ শব্দ করে ডাক শুরু করে দিয়েছে ঘাসের বনে।

নালু বল্লে, চল নীলি। মা বকবে—এমন সময় তার পায়ের তলায় পদ্মবনের মধ্যে কি একটা জিনিস পিছলে গেল, সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল অন্যমনস্ক হয়ে।

চক্ষের পলকে নালু চেঁচিয়ে উঠল,—সাপ! সাপ!—আমাকে খেয়ে ফেল্লে। ওমা—ওমা—উঁহু—উ—হু—

নীলি লাফিয়ে এল ওর কাছে—ভয় কি? ভয় কি? কোথায় সাপ?

—আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে—ও নীলি—আমি মরে গেলাম—মাকে বোলো—পা দিয়ে চেপে ধরিছি—উঁহুহু—

নীলি জলে ডুব দিয়ে তার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নালুর পায়ের তলা দেখতে গেলো এবং পরক্ষণেই প্রায় আধসের-আড়াইপোয়া ওজনের মস্ত একটা মাগুর হাতে তুলে ভেসে উঠলো, হাঁফাতে হাঁফাতে হাসিমুখে বল্লে,—এই দেখো তোমার সাপ—মাগুর মাছে কাঁটা হেনেছে। আর ও ভাবছে সাপে খেয়ে ফেল্লে—সাপ অত সোজা নয়—

—দেখি, দেখি। ওঃ, এ যে মস্ত বড় মাগুর—

নালু পা দিয়ে কাদার মধ্যে সেটাকে চেপে ধরাতে মাছটা উপরি উপরি কাঁটা হেনেছে। পা টনটন করছে ওর। মাছটা ডাঙায় তুলে এনে ওর সব যন্ত্রণা সেরে গেল। ওরা অন্ধকার বাঁশবনের আমবনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলো।

নীলি বল্লে,—মাছটা তুমিই নেও সবটা নালু। তোমাকে কাঁটা হেনেছে,—আর তুমিই পা

দিয়ে চেপে ধরলে—

—না নীলি। তোমার আদ্ধেক আমার আদ্ধেক। এসো আমার সঙ্গে—

অন্ধকার উঠোনে পা দিয়েই নালু চেঁচিয়ে উঠলো—মাগো—কি এনেছি মা, মস্ত এক মাগুর মাছ—তার পরেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কে একজন চমৎকার মেয়েমানুষ সেজেগুজে ওদের ঘরের ছোট্ট বারান্দাতে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মা বল্লে,—এদিকে এসো। দিদি এসেছেন, প্রণাম করো। তোমার মেজদিদি—

নীলি পেছন থেকে জিগ্যেস করলে—কে উনি দিদি ?

ননীবালা গর্ব্বের সুরে বল্লে,—আমার মেজ মেয়ে সীমা। তিনটে পাস। কলকাতার মেয়ে-ইস্কুলে কাজ করে। সোনার টুকরো মেয়ে। নালুকে নিতে এসেছে। বলছে, মা, আমার কাছে দাও, আমি নিয়ে গিয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাবো। ছোট বোনটাকে এভাবে গাঁয়ে ফেলে রাখতে দেবো না। তা আমি বলছি,—তোমাদের জিনিস তোমরা নিয়ে যাবে, আমার বলবার কি আছে! তোমরাই তো ওর অভিভাবক, আমি কি বুঝি, মুখ্যু মা তোমাদের—

সীমা উঠে এসে নালুকে জড়িয়ে ধরলে দু'হাত দিয়ে।

ওর মা বল্লে—তোমার কাপড়ে কাদা লাগবে, বোসো মা সীমা, আমি আগে ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিই।—

সীমা বল্লে,—আমি দিচ্ছি। কেন, ও কি আমার বোন নয় ? কি চমৎকার দেখতে হয়েছে খুকী! নাম কি বিচ্ছিরি রেখেছো মা! সরবালা! সরবালা আবার কি ? আমি নাম রাখবো শকুন্তলা, কি সুন্দর চোখ দুটি। এক বছরের ছোট্ট খুকী দেখেছিলাম—

সত্যি, আজ কি অদ্ভুত সকালটা হয়েছিল। কার মুখ দেখে উঠেছিল ননী তাই ভাবছে। বিকেলে সে পুকুর থেকে কাপড় কেচে এসেছে সবে, এমন সময় একখানি ঘোড়ারগাড়ি এসে ওর দরজার সামনে দাঁড়ালো। বেলা তখন আর নেই। ননী একদম চিনতে পারেনি। দশ বছর পরে সে দেখলে সীমাকে। উনিশ বছরের সীমার বয়েস আজ উনত্রিশ। চোখে আবার সোনা-বাঁধানো চশমা।

সীমা রাতে কত কথা বল্লে। সুললিতা দিদি মজঃফরপুরে থাকে তার স্বামীর কর্ম্মস্থলে। সীমা কলকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে পড়েছে। বাবার ব্যাঙ্কে টাকা ছিল, ডাকঘরে টাকা ছিল, সব নিয়েছে বড়দি আর তার স্বামী। সীমা জানতে পেরে বলেছিল, তোমরা গরীব মাকে ফাঁকি দিলে। তাঁর কি আছে ? তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়েটাকে কি করে মানুষ করবেন ? সুললিতা নাকি বলেছিল—যা, যা, বড্ড যুধিষ্ঠির তুমি! সৎমা গেঁয়ো মেয়ে না হলে সেই আমাদের সব গপ্পায় পুরতো কি না ? সৎমা, সৎবোন কখনো আপন হয় না।

সীমাকে খেতে দিয়ে ননী বল্লে,—কিছু খেতে দেবার ছিল না। ভাগ্যিস, মাগুর মাছটা এনেছিল নালু বিল থেকে ধরে! বুঝলি নালু, তোর মাছ ধরা সাত্যোক হ'ল।

সীমা পরদিন বিকেলে সরবালাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলো। যাবার সময়ে বল্লে,—মা, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বাসা ঠিক করি আগে। বাসাটা ছোট। শকুন্তলার জন্যে (এরই মধ্যেই সে নালুর নতুন নাম দিয়ে ফেলেছে) ভেবো না। ওকে গিয়েই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে নিয়ে এসে দেখিয়ে যাবো একবার। ও যে আমার বাবার মেয়ে, তা আমি কি ভুলতে পারি মা ? পুজোর পর তোমাকেও যেতে হবে। রান্নার ডিপার্টমেণ্ট তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমরা দুই বোন লেখাপড়া নিয়ে থাকবো।—কি বলিস্ শকুন্তলা ?

বিরজা হোম ও তার বাধা

ভৈরব চক্রবর্ত্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেক দিন আগেকার কথা। বোয়ালে-কদরপুর (খুলনা) হাইস্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করতো, মানতো। এক প্রহর ধরে জপ-আহ্নিক করতেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের জলস্পর্শ করতেন না, মাসে একবার বিরজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো দুপুরের পরে। স্ব-পাক ছাড়া কারো বাড়ি কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন বলতেন শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্ত্তী ভাল সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোন স্কুলের পণ্ডিতি করেননি। টোল করাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গবর্নমেণ্টের দেয় বৃত্তির দিকে বড় মন চলে যায়। টোল! ইন্সপেক্টরদের খোশামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সেবার নামে-নামে করেও নামছিল না, দিনে-রাতে গুমটের দরুন আমরা কেউ ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পূব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পরে। কিন্তু এত দুর্দান্ত গরম যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্ত ছেলেরা তদবির করছে, মাস্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিল বারো আনা। হেড্ মাস্টার আপিস ঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার, গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বল্লেন,—সার, মেঘ করেছে—

মুরলী মুখুজ্যে (এই নামেই তিনি এ অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে বল্লেন,—কিসের মেঘ?

—আজ্ঞে, মেঘ যাকে বলে।

—কি হয়েছে তাতে?

—আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভালো হোত! ছেলেরা অনেক দূর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

—বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের আপিসের হেড কেরানীও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা বলতে দ্বিধা করতো বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়া তত্ত্বটি তাঁর নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন—বৃষ্টি হবে না?

—না।

—কেন সার? বেশ মেঘ করে এসেছে তো?

—মেঘের আপনি কি বোঝেন? ওকে বলে তাতমেঘা, ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখেছিলাম এবং আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বল্লাম—বৃষ্টি হবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন—তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়?

—এখন বৃষ্টি হবে আলট্রা স্ট্রাটোস্ মেঘে। যাকে বলে শিট্‌ক্লাউড।

—ও!

—তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মনসুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পূবে।

—ও!

আর কোনো কথা বলতে আমাদের সাহস হোল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্থ করলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠলো, মেঘের চাদর ঢাকা পড়লো আরও ঘন আর একখানা মেঘের চাদরে। তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্ ঝম্ মুষলধারে বর্ষা নামলো। পুরো ছুটি ঘণ্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনো পর্য্যন্ত স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায় আর যাবে। সবাই আমরা আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্জ্যেকে গিয়ে বল্লেন—দেখলেন সার, তখন বল্লাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটিটা দিলে আর এমন হোত না।

মুরলীবাবু বল্লেন—অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematics পড়ালে বুঝতেন। জগতে space and time নিয়ে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্নেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন এ বছরের Mathematical Gazette-এ, বুঝলেন?

—সেটা কি?

—এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পড়েছেন তো? অঙ্কশাস্ত্রে এ্যালিস্ থ্রু লুকিংগ্লাসের পরীক্ষা আর কি। পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে এলেন। অঙ্কশাস্ত্রের কথা উঠলেই স্বভাবতঃ তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে বড় খুশি। হেড্ মাস্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি!

এমন সময় ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বাড়ির দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্ত্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশি মন। আমাকে দেখে ডেকে বল্লেন—কেমন ননীবাবু, বিষ্টি হোল তো?

—এই যে চক্কোত্তি মশায়, নমস্কার। তা হোল।

—হবি না? আজ তিন দিন থেকে হোম করছি বিষ্টির জন্যে। ওর বাবাকে হতে হবে।

অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে, তা ভালো জানা ছিল না। বল্লাম—বলেন কি? হোম করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে!

গোপীবাবু অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলে বসলেন—লাগে তাক, না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বল্লেন—আসুন দুজনেই আমার বাড়ি মাস্টার বাবুরা। দেখুন দেখাই।

গোপীবাবু ও আমি দুজনে দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। মনটা বেশ ভালো। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনেরো দিন দারুণ গুমটে রাত্রে ঘুমুইনি।

গোপীবাবু কেবল বলছিলেন—আজ খুব ঘুম হবে, কি বলেন?

—নিশ্চয়। তার আর ভুল?

ভৈরব চক্রবর্ত্তী আমাদের নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনের কুণ্ডু—বালি বিছিয়ে তৈরি, বেলকাঠ ও জগ্‌গিডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ)

এক পাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো, তামার টাটে নারায়ণশীলা! সিঁদুর বেলপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক ওদিক ছড়ানো।

ভৈরব চক্কত্তি বল্লেন—দেখলেন মাস্টারবাবু? হোম করার ফল আছে কি না দেখলেন?

গোপীবাবু বল্লেন—আপনি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতার কাণ্ড দেখেছি যে কত। পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপ করার সময়!

—বলুন না দু'একটা ঘটনা?

—না, সে-সব বলবো না। থাক গে। কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখেছিলাম আমার এক যজমান-বাড়ি। সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হোল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠলো খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার। ছড়্ ছড়্ করে পাকা জাম পড়তে লাগল চক্কত্তি মশায়ের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে। নতুন জলে ব্যাঙ ডাকতে লাগলো চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুইনি। এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবার উপায় নেই। বেশ জমিয়ে গল্প শুনবার জন্যে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর মাটির দাওয়ায় মাদুরের ওপর বসে গেলাম।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু করলেন গল্প বলতে:

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনো বছর পোরেনি। আমার এক যজমান-বাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ। আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্যে। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভালো হয়ে যায়। আমি এমন সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকো করে নিয়ে গেল গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘরকতক ব্রাহ্মণ ও বেশির ভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস। যমুনার ধারেই গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কি?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম বিকেলে। খুব বন-জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইটের তৈরি। মন্দিরের মাথায় বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে। প্রকাণ্ড বড় একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে, চামচিকের নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময় আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়ে শৈল চালভাজা ও ছোলাভাজা নিয়ে এলো তেলনুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্ত্তী বিপত্নীক, তার মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সবে ক'দিন হোল, চলে গেলে চক্রবর্ত্তী মশাই নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সকলেই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্ত্তীও সেই সঙ্গে। এখনও দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল-ছোলাভাজা যে খেতে পারে, তার বহুদিনেও দাঁত নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চল্লেন—এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো-চোদ্দ হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—গলায় একরাশ

মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই এবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর, তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলাম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ আছে বলে মনে হোল না। তাছাড়া, আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে!

গৃহস্বামী বল্লেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন মাথায় ওর।

পায়ের ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল খাটের পাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কি হয়েছে দেখতে। কিছুই সেখানে নেই, না একটা কলার খোসা না কিছু। লোকটি পড়লো কি করে? পায়ের ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগলো। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম করি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষণ, প্রতিলক্ষণ, চিহ্ন আর ইঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এর লক্ষণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসবো না? সন্ধ্যার কিছু পরে শিবমন্দিরের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছি। বড্ড গরম। বাড়ির মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে—শুনুন, শুনুন। দুবার কানে গেল কথাটা। এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়লো শিবমন্দিরের মধ্যে ঠিক দোরের গোড়ায় একটি কে মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে।

বল্লাম—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ। ও খুকীর জন্যে বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।

—কে আপনি?

—আমি যে-ই হই। যদি ভাল চান, হোম করবেন না।

আমি বিস্মিত হোলাম। নির্জ্জন, অন্ধকার, ভাঙা মন্দির। সেখানে এখন মেয়েমানুষ আসবে কে? এমন আশ্চর্য্য কথাই বা বলে কেন? আমার খানিকটা রাগও হোল। আমার ইচ্ছার ওপর বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূরের কথা, অপদেবতাকেও কখনও গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আশীর্ব্বাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈরব চক্রবর্ত্তীকে ভয় দেখানো সহজ নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বল্লাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্রের ফর্দ্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল, গৃহস্বামী আমাকে রান্নাবান্না করতে বল্লেন। এইবার আমার গল্পের আসল অংশে আসবো। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোনো ছিরি সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা। পল্লীগ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা, সামান্য দূরে। মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ঐ বাড়ির ছাদ আর এ বাড়ির ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট চওড়া এককালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল, আতপ চাল, বড়ি, আলু

আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কাছে কেউ থাকে আমি পছন্দ করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরি চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু জিরিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আউট-কলার পাতে। তারপর খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোল ছাদে আমি একা নেই। এদিক ওদিক চাইলাম, কেউ কোথাও নেই, রাত বেশি হয়েছে, বাড়ির লোকও নিচের তলায় খেয়েদেয়ে শুয়েছে, গ্রামই নিষুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম।

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কি গাছ? কালো মত, লম্বা তাল গাছের মত? এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি, কই অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো এর আগে? ছিল নিশ্চয়ই, নয়তো এখন দেখছি কি করে। কি গাছ ওটা! সত্যি, যখন চা খেলাম, তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার ওই রাস্তাটা দিয়ে একখানা গরুরগাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে আমাকে ওদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন, কই তো অত বড একটা তাল গাছ—উঁহু, কই! নাঃ, দেখিনি।

কিন্তু তাল গাছটা এমনভাবে—ও কি রকম তাল গাছ? ওকি! ওকি!

আমি ততক্ষণ বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে উঠে পড়েছি।

তাল গাছ না।

এখনো ভাবলে—এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্কত্তি, তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মত মূর্ত্তি, তার তত বড় বড় হাত পা—সেই মাপে। মাথাটা একটা ঢাকাই জালার মত, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত রাঙা, আগুন ঠিকরে পড়ছে! আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা, যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্ত্তি। তালগাছের মতই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নিচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। দু'দুবার চোখ রগড়ালাম। দুবার চা খেয়ে কি এমন হোল? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল শাল নারকোল গাছের মত তে-ঢ্যাঙা বেখাপ্পা অপদেবতার মূর্ত্তি বিরাজ করছে সামনে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভালো করে দেখে মনে হোল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই—দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায়! কারণ ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্য্যন্ত আমার সামনে। তার নিচেকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নিচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগলো, অতটা সময় লাগেনি আমার বারকয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুনতে যত সময় লাগে, ব্যস্। আমি বলতে পারি অন্য যে কেউ ওই বিকট অপদেবতার মূর্ত্তি অন্ধকারে নির্জ্জনে ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেতো না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাতো। কিন্তু সে এ ধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে গেলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কি। পড়লেই হয়ে যেতো। দুর্ব্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হোলে ওরাই পালায়।

নিজেকে তখুনি সামলে নিলাম। তারামন্ত্র জপ শুরু করলাম জোরে জোরে। সেই দিকে

চেয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্ত্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুনতে যতটা সময় নেয় ততটা। এর খুব বেশী হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর একবার চোখ রগড়ালাম, কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচের তলা থেকে কান্নাকাটি উঠলো। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

—তখুনি ?

—তখুনি। এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনার কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

বুড়ো হাজরা কথা কয়

সকাল বেলা পাঁচুদাসী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

সারাদিন নৌকো বেয়েছে মাঝি, সন্ধ্যায় বনগাঁ ইস্টিশানে এসে পৌঁছোয়। কতদূরে যেতে হবে তা সে জানতো না। কত জলকচুরির দামের ওপর পানকৌড়ি বসে থাকা, ঝিরঝিরে-হাওয়ায়-দোলা বাঁশবনের তলা দিয়ে দিয়ে নৌকো বেয়ে আসা; জলকচুরির নীল ফুলের শোভায় গলুসি-বদ্দিপুরের চর আলো করে রেখেচে; কত বন্যেবুড়োর গাছে গাছে ঠাণ্ডা নদীজলের আমেজে বকের দল, পানকৌড়ির দল বসে ঠিক যেন ঝিমুচ্চে।

পাঁচুদাসীর স্বামী উদ্ধব দাস বেশ জোয়ান-মর্দ্দ লোক। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওর—শক্ত হাত-পা, এই লম্বা এই চওড়া বুক, এই হাতের গুলি, এই বাবরি চুল। জাতে কাপালী, বন-জঙ্গল উড়িয়ে তরিতরকারির আবাদ করে সোনা ফলায়। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ওরা এসে এখানে বাস করচে আজকাল সেই সব গাঁয়ে, যেখানে দশ বছর আগেও ছিল কাঁটাবন, ঝোপ-জঙ্গল। যা-হোক দু'পয়সা রোজগারও করে, বিশেষ করে আজকাল যুদ্ধের দরুণ তরিতরকারির যা দাম।

উদ্ধব বল্লে স্ত্রীকে—চিঁড়ে কতগুলো আনলি ?

পাঁচুদাসী বেশ শক্ত-সমর্থ মেয়েমানুষ। একহারা, লম্বা, শ্যামল, উনিশ-কুড়ি বয়েস, মুখের ভাবে বেশ একটা কাঁচা লাবণ্য মাখানো—অথচ একা সংসারের সব কাজ মুখ বুজে করে যাবে, চার-পাঁচটা হালের গরুর ডাবায় জল তুলবে কুয়ো থেকে, বাইরের বড় গোয়াল পরিষ্কার করবে, দশ গণ্ডা বিচালির আঁটি কাটবে—তারপরে আবার রান্নাবাড়া করবে—স্বামীর মাঠের পান্তাভাত, গরমভাত, জনমজুরের ভাত—এসো-জন, বসো-জন, গেরস্থর সবই তো থাকে। রাতদুপুরে লোক-কুটুম্ব এলে পাকি আড়াই-সেরা কাঠার এক কাঠা ডবল-নাগরা চালের ভাত বড় তোলো হাঁড়িটায় চড়িয়ে দেয় এক নিমেষে। দেখতে নরম-সরম হোলেও লোহার মত শক্ত হাত-পা।

পাঁচুদাসী একটা ছোট থলে নৌকোর খোল থেকে টেনে বার করে হাতে আন্দাজ করে বল্লে—কাঠা দুই—

—ওতেই হবে!

—আমি তো উপোস। শুধু তুমি আর মাঝি ছোঁড়া খাবে—

—তেঁতুল এনেছিস্ তো ?

—হুঁ-উ-উ।

স্বামীর দিকে বঙ্কিম-কটাক্ষে চেয়ে বলে—যত পারো—

তারপর আবার নৌকা চললো উলুটি বাড়োর কিনারায় কিনারায়, নদীর ঠাণ্ডা শ্যামল জল-ধারা যেখানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে ভাঁটার টানে সাতভেয়েতলার বড় বটগাছের দিকে। উদ্ধব দাস তামাক খাবার জন্যে চকমকি ঠুকচে, মাঝিকে বলচে—ইদিকি এবার বাগুনের বীজপাতা দেওয়া হয়নি দেখচি—হ্যাঁ রে, এ ক্ষেতটা কি জেড়ো কুমড়োর ?

মাঝি বল্লে—জেড়ো কুমড়ো না হলে কি অত বড়ডা হয়—ছাখচো না ?

—চত্তির মাসের শেষ—এখনো ক্ষেতে শীতের কুমড়ো কাটেনি—কেমনধারা চাষা এরা ?··· তামুক খাবা ?

মাঝি ছোঁড়া ঘাড় নেড়ে বল্লে—খাইনে।

—তোর দাদা মনিন্দর তো খায়।

—খায় না ? বলে হুঁকো শোষে। দাদা খায় বলে কি আমাকেও খেতে হবে ?

—না তাই বলচি।

—কি চর এডা ? আর কদ্দূর ?

—চর পোলতা। আর দু'খানা বাঁক।

—বাঁকের মুড়োয়, না বাঁকের মাজায় ?

—একেবারে ও মুড়োয়—

—তাহ'লে এখনো দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা—

পাঁচুদাসী দেখতে দেখতে যাচ্ছে, বেশ ভাল লাগছে ওর। বাড়ি থেকে কত দিন একটু বেরুনো হয়নি, শুধুই গোয়াল পরিষ্কার, ক্ষার কাচা, বাসন মাজা, তোলো তোলো ধানসিদ্ধ, গরুর ডাবায় জল তোলা···এ যেন মুক্ত দিনের লীলায়িত অবকাশ! দিন-শেষের হলদে রোদে আকাশ কেমনতর হয়ে উঠচে, নৌকোর গলুইয়ে চলমান নদীর ছলছল রাগিণীর ছন্দ বাজচে, গলা-লম্বা কি পাখী শেওলার মধ্যে জেলেদের পাতা তেঁতুল ডালের ছড়ির ওপর বসে নৌকোর দিকে চেয়ে আছে, নলখাগড়ার বনের গত শীতকালের তিতপল্লার ফল শুকিয়ে শুকিয়ে ঝুলচে, ভুস ভুস করে শুশুক ডুবচে উঠচে জলে নৌকোর এপাশে ওপাশে।

—হ্যাগো, ওগুলো কি, শুশুক না কচ্ছপ ?

—শুশোক—

—আহা-হা, শুশোক বুঝি ?—শুশুক তো বলে। বাঙাল কোথাকার।

পাঁচুদাসী নাগরিকতার আভিজাত্যে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসির ঝিলিক দিয়ে স্বামীর দিকে চায়।

—নাও, নাও, ওই হোল, শুশুকই হোল—

—খিদে পেয়েচে ?

—পাইনি ? সে তুই বুঝচিস নে ? তোকে বলতে হবে ?

ঠিক ঠিক। পাঁচুদাসীর ভুল হয়ে গিয়েচে। ওর বড় খিদে, জোয়ান মরদ পুরুষ, ভূতের মত খাটে দিন-রাত, মাটির সঙ্গে কাজকারবার। একটি কাঠা তার নাম। চিঁড়ে আর তেঁতুল আর লবণ আর আখের গুড়। এক নিঃশ্বাসে কাবার করবে। ওর খাওয়া একটা দেখবার মত জিনিস বটে।

বালাই ষাট, চোখ দিতে নেই।

—আঙট পাতায় দেবো তো!

—ভিজিয়েচ ?

—না, এই গামছায় বেঁধে দিচ্চি—নৌকো থেকে জলে ডুবিয়ে খানিকটা বসে থাকো! বাঁশমলা ধানের চিঁড়ে, এখুনি ভিজে কাদা হয়ে যাবে। ওই মাঝি ছোঁড়াকেও দিই ওই সঙ্গে —তাকেও বলো—

চর পোলতা ছাড়িয়ে দু'ধারে বনজঙ্গল, ঘাটবাঁওড়ের চর। ওরা একমনে খেয়ে যাচ্চে, মাঝি নৌকো বেঁধেছে একটা ঝাঁড়া ঝোপের কোলে। বড় কুবো পাখী পাখা কট্‌পট্‌ করচে আলোক-লতার জালের আর কুঁচকাঁটার জটিল ডালপালার নিবিড়তায়। কাল রাতের সে স্বপ্নটার কথা মনে পড়ায় পাঁচুদাসীর সারা গা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

আর ঠিক কি কাল-রাতেই!

যে ভোরবেলা নৌকো ছাড়বে মিশেনখালি যাবার জন্যে, ঠিক তার আগের রাতেই!

সারা গা যেন শিউরে ওঠে আনন্দে ও বিস্ময়ে।

স্বপ্ন দেখলে সে যেন তাদের বাড়ির উত্তরদিকে যে কলুদীঘি আছে, তার উঁচু পাড়ে বড় ঘোড়া-নিমগাছটার তলায় অকারণ দাঁড়িয়ে আছে। ঘেঁটু ফুল দুটি আলো করেছে দীঘির পাড়, এখন চৈত্র মাসে তার মাঝে মাঝে কালো শুঁটি ধরেছে—সেখানটাতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময়ে একটি ছোট্ট ছেলে বনের দিকের কোথা থেকে যেন এল। ওর হাঁটু ধরে দাঁড়ালো, ওর মুখের দিকে চাইলো—ওর হাতে একটা পাকা বেগুন ঝোলানো, তাদের ক্ষেতে বীজপাতা দেওয়ার জন্যে যেমন বেগুন টাঙানো থাকে বাইরের চণ্ডীমণ্ডপের আড়ায়। বল্লে—তোর কাছে আমি আসবো মা?

পাঁচুদাসীর নিঃসন্তান বুভুক্ষু প্রাণ বলে উঠলো—আসবি খোকা? আসবি? তোর হাতে ও কি?

—বাগুন। তোদের ক্ষেতে নিড়েন পাট করে পুঁতে দেবানি—

—ওরে আমার সোনা! ক'নে ছিলে এমন মানিক? আয় আয়—

কি চমৎকার মুখখানা খোকার। ওই ছিরু ঘোষের মেজ নাতির মত দেখতে। পাঁচুদাসীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো স্বপ্নের কথা ভেবে। কোথায় হারিয়ে গেল সে মুখ। স্পষ্ট মুখখানা মনে পড়ে এখনো! চোখে জল এসে পড়ে পাঁচুদাসীর।

সত্যি যেন এ স্বপ্ন! সত্যি হবে?

আজই বিশেষ করে ও-স্বপ্ন কেন?

আজ পাঁচটি বছর বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলে নেই, মেয়ে নেই। নিঃসন্তান দাম্পত্য সংসারের আকাশে বাতাসে আড়ালে অবকাশে নিষ্ঠুর কালো ছায়া ফেলে থমথমিয়ে থাকে, অথচ অভাব তো নেই সংসারে। গোলাভরা ধান, ডোলভরা মুসুরি, ছোলা, ক্ষেতপোরা বেগুন, কুমড়ো, ঢেঁড়শের চারা ঠেলে উঠেছে কানিজোলের ক্ষেতে। গত শীতকালে সাতগণ্ডা ভাঁড় খেজুর গুড়ে ভর্তি করে আড়ায় তুলে রেখেছে বর্ষাদিনের জন্যে। হাট্‌রা হাট চার-পাঁচ টাকা শুধু বেগুন কুমড়ো বিক্রি। লাউ কী মাচায়! যেমন তেজালো লতা, তেমনি তার ফলন! সূর্য্যমুখী লঙ্কা খেতে দুদিকে মুখ করে যেন চোদ্দ পিদিম জ্বালিয়ে রেখেছিল মাঘের শেষেও।

উদ্ধব দাস খাওয়া শেষ করে থালা ধুয়ে ফেল্লে নদীর জলে। মাঝি ছাড়লে ডিঙি। পশ্চিম আকাশে মেঘ জমে আসচে, কালবোশেখীর দিন, উদ্ধব বল্লে—ও মাঝি, হাত চালিয়ে নাও—ওই ছাখো—

মাঝি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঈশান কোণের আকাশে চেয়ে বল্লে—তাতমেঘা। জল হবে না।

—তোকে বলেচে!

—দেখে নিও মোড়ল। তাতের মেঘ, বাতাস উঠতি পারে, জল হবে না।

—বাতাস উঠলেও তো মুশকিল। হাত চালিয়ে নাও—এবার ক'খানা বাঁক?

—আর একখানা। ওই পাইকপাড়ার বটগাছ থেকে শুরু হোল বাঁকখানা। ওর ও-মুড়োয়—

পাঁচুদাসীর মজা লাগে ওদের কথাবার্ত্তা শুনতে।

বাড়ি থেকে বেরুলে দুশো রগড়। আজ চরের কাশবনে চড়ুইভাতি চাঁদের আলোর তলায়। বাঁশের চোঙে ফুঁ পেড়ে ধোঁয়াভরা রান্নাঘরে ভাত রান্না নয়। কি বিশ্রী এবারকার তেত্তি বীজ গাছের চালাগুলো। আগুন ধরতে কি চায়! ফুঁ পেড়ে পেড়ে চোখ রাঙা হয়ে যায় একেবারে। সেই ছোট্ট খোকা যেন ওই চরে কাশের ডগায় ডগায় ফড়িং প্রজাপতি ধরে বেড়াচ্ছে। তাকেই ও দেখচে সর্ব্বত্র। সব সময়ই তার কথা মনে পড়চে।

স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

যদি সত্যি হয়! কে বলতে পারে?

ওর সারা গা আবার যেন শিউরে ওঠে।

সন্ধ্যার আর দেরি নেই। ওই দূরে বাঁ-দিকের পাড়ে একটা ইটের পাঁজা। অন্যদিকে হলদে রঙের কোঠাবাড়ি একটা। বড় বড় গাছের তলায় আরও দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ে। পাঁচুদাসী জিগ্যেস করলে—হ্যাগা, ওই বাড়িটা কাদের? ভালো বাড়ি।

মাঝি বল্লে—ওটারে বলে ডাক-বাংলা। সাহেবরা এসি থাকে।

উদ্ধব দাস বল্লে—সেবার বাগুন বিক্রি করতি এসে দেখি ওর বারান্দায় গোরা সাহেব পিলপিল করচে। এই সঙ্গে মটোর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভিড় কি! সাহেবের ছেলেরা ছুটোছুটি করচে ইদিকি ওদিকি।

পাঁচুদাসী কি ভেবে বল্লে—হ্যাগা, সাহেবদের ছেলেরা দেখতি কেমন?

—খুব ফরসা।

—কেমনধারা ফরসা?

—সে কি বোঝাবো তোরে? তুই পাড়াগেঁয়ে ভূত। সাহেবের কি বুঝিস্?

—আহা-হা! আর উনি একেবারে শহুরে বাবু! সেই একবার বাগুন বেচতি তো এসিছিলে—বলে জন্মের মধ্যি কস্ম, চত্তির মাসে রাস!

ওরা ডাঙ্গায় জিনিসপত্র নামালো। হেঁসে যেতে হবে ইস্টিশানে—আধকোশটাক ডাকবাংলার ঘাট থেকে। একটা ভারি বোঁচকা, এক বোঝা ডাঁটা আর কুমড়ো শাক এই সঙ্গে। পাঁচুদাসী বোঁচকা কাঁখে পেছনে পেছনে চললো—আগে আগে উদ্ধব দাস! মাঝি রইল ঘাটেই, ঝাল-তলায় সে রেঁধে-বেড়ে খাবে, নৌকোতে শুয়ে থাকবে রাত্রে—আবার কাল রাত দশটার সময় ওরা ফিরবে, নৌকো ছাড়া হবে তখন।

উদ্ধব দাস বল্লে—তোমার কি কি লাগবে বল, কিনে দিয়ে যাই—

—হাঁড়ি একটি, সরা একটি,—আর খলি মাছ যদি বাজারে পাই, মাছের দামটা দিয়ে যাও।

—মুসুরি ডাল খাবা। এক সের ডাল দিইচি আবার মাছের পয়সা; ভারি বড়নোক দেখেচো মোরে!

মাঝি অনুনয়ের সুরে বল্লে—দিয়ে যাও মোড়ল। আমাদের ওদিকি খয়রা মাছ খেতি পাইনে। যদি কাল বাজারে খয়রা মাছ পাই—চার আনা দ্যাও।

পাঁচুদাসী স্বামীকে ধমক দিয়ে বল্লে—দ্যাও না গো ওকে। ছেলেমানুষ। যাচ্ছি একটা শুভ কম্মে। যা খেতি চায় ওর প্রাণ, দাও ওকে। চারগণ্ডা পয়সা দাও মাছের আর দু-আনা

দাও রসগোল্লার—

উদ্ধব দাসকে অগত্যা নগদ ছ'আনা পয়সা দিতে হোল মাঝির হাতে। মেয়েমানুষের নাই পেলে কি আর রক্ষে রাখে লোক? যাকগে।

কখন গাড়ি আসে নাভারনের ওরা কিছুই জানে না। স্টেশনে গিয়ে জিগ্যেস ক'রে জানা গেল নাভারনের গাড়ি আসবে কাল ভোরবেলা। কেউ জানে না সেকথা। পাঁচুদাসী স্বামীকে বকলে, না জেনেশুনে আসো কেন? নৌকোতে রাত কাটালে দিব্যি হোত। এখানে কি শোবার জায়গা আছে? এত ভিড়, এত লোকের চিৎকার—মাগো, ইস্টিশান নয়—যেন কুঁদিপুরের গাজনতলায় আড়ং বসেচে।

উদ্ধব দাস অভিজ্ঞতার অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে—তুই থাম দিকি। তুই চিনিচিস্ কেবল কুঁদিপুরের গাজনতলার আড়ং—দেখলি বা কি জীবনে?

—তুমি খুব দেখেচো তো? তা হোলেই হোলো—

—তোর চেয়ে তো বেশি। আমি আসিনি বনগাঁ ইস্টিশান? শেয়ালদ' গিইচি আলু-পটলের আড়তে। এই রেলে চড়ে যেতি হয়। সাড়ে চোদ্দ আনা ভাড়া। এই দিকি—

উদ্ধব দাস আঙুল দিয়ে কোলকাতা লাইনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালটা দেখালে।

উদ্ধব দাস জিগ্যেস করে একজন কুলীকে—বলি শোনো, একটু ভালো জল পাওয়া যায় ক'নে?

কুলী আধা বাংলা আধা হিন্দিতে যা বলে গেল তার অর্থ এই—ভালো জল আমি পাব কোথায়? নিজে খুঁজে ছাখো।

একজন ওদের বলে দিলে, ওভারব্রিজের ওপর বিছানা করে শুতে। ওখানে হাওয়া আছে, মশা লাগবে না, প্ল্যাটফর্মে বেজায় মশা।

ওরা তাই করলে বটে, কিন্তু রাতে পাঁচুদাসীর মোটে ঘুম হলো না। হৈ-চৈ চিৎকার, রেলগাড়ি আসচে সারা রাত ধরে। কত কষ্টে ভোর হোল। রাত আর পোহায় না।

ঘুমজড়িত কণ্ঠে পাঁচুদাসী বল্লে—হ্যাগো, ওই চা কি লোকের খাবার সময় অসময় নেই গা? সারা রাতই চা গরম! লোকে ঘুমুবে না চা খাবে? চক্ষেও কি ওদের ঘুম নেই? এমন অনাছিষ্টি কাণ্ডও যদি কখনো দেখে থাকি!

ভোরে নাভারনের ট্রেন এল। লোকজন সব উঠলো। ওরাও উঠল। আবার সেই ছোট খোকার মুখ মনে পড়লো পাঁচুদাসীর। সেই ছোট্ট সুন্দর মুখখানি, সম্মুখের এক অজানা দিনের কোণ থেকে উঁকি মারচে, কিসের আড়াল ওদের দুজনের মাঝখানে? হাজরাতলার বুড়ো হাজরা ঠাকুর কি সে আড়াল দূর করতে পারবেন!

নাভারন ছোট্ট ইস্টিশান।

সামনের চওড়া পাকা রাস্তা গিয়ে ওধারের বড় রাস্তায় মিশেচে। বড় বিলিতি চটকা-গাছের সারি পথের দুধারে। পাঁচুদাসী বল্লে—ও রাস্তা কোথাকার গো?

উদ্ধব দাস জানে না। বল্লে—কি জানি? বলতে পারিনে।

একজন গাড়োয়ান ধানের বস্তা নামাচ্ছিল গরুর গাড়ি থেকে, সে বল্লে—ওই রাস্তা? ও গিয়েছে যশোরে, ইদিকে কলকাতায়। ওর নাম যশোর রোড।

যশোর রোড! যশোর রোড! পাঁচুদাসীর মুখে হাসি এসে পড়ে অকারণে! কি নাম যে বাপু!

উদ্ধব দাস সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে বললে—নিশেনখালির হাজরাতলায় নিয়ে যাবা?

—তা যেতি পারি। ক'জন ?

—দুজন। এই তো দেখতে পাচ্চ।

—আজ পরবের দিন, সেখানে বড্ড ভিড় হয়, কত দেশ থেকে হাজরাতলায় পুজো দিতি লোক আসে। পাঁচটি টাকা ভাড়া লাগবেক যাতায়াতে।

এমন সময় পাঁচুদাসী লক্ষ্য করলে দামী শাড়ি পরনে একটি সুন্দরী বৌ স্টেশনের বাইরে জামতলাটায় ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর সঙ্গে একটি ফরসা জামাকাপড় পরা ভদ্রলোক, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। পেছনে পেছনে একটা চাকর গোছের লোক, তার হাতে চামড়ার একটি বাক্স। বৌটি তাকে বল্লে—তুমি কোথায় যাবে ?

পাঁচুদাসী সঙ্কোচের সুরে তাকে বল্লে—নিশেনখালির হাজরাতলায়—

বৌটি পেছন ফিরে তার সঙ্গী ভদ্রলোককে বল্লে—ওগো, এরাও সেখানে যাচ্ছে—

ভদ্রলোকটি উদ্ধব দাসকে বল্লে—তোমরাও হাজরাতলায় যাবে ?

—হ্যাঁ বাবু। আপনারাও সেখানে যাবেন ?

—আমরাও সেখানে যাচ্চি। কত দূর ?

—তা তো বাবু জানিনে। আমরা নতুন যাচ্চি। আজ মঙ্গলবার, সেখানে আজ পুজো দিতে হয়, তাই যাবো। আমাদের বাড়ি অনেকদূর এখান থে।

—তাই তো! এ যে অজ পাড়াগাঁ দেখছি। কোথায় কতদূর যেতে হবে না জানলে এখন করি কি—

—বাবু, এই গরুরগাড়ি সেখানে যাবে বলছে। পাঁচ টাকা ভাড়া। চলেন ওই গাড়িতেই সবাই যাই। আপনারা এখন গাড়ি পাবেনই বা ক'নে, মাঠাকরুণ না হয় গাড়িতে উঠুন, আমি হেঁটে যাবো এখন।

বেলা বারোটার সময় ওরা একটা আধমজা নদীর ধারে এসে হাজির হোল। নদীর নাম ব্যাং নদী—দুধারে বনজাম আর হিজল বাদামের বন, বাঁশনি বাঁশের বন আর বেতঝোপ। অত বেলা হোলেও রোদ নেই নদীর এপারে, দিব্যি ঘন ছায়া। গাড়োয়ানের মুখে শোনা গেল নদী পার হয়ে আধক্রোশটাক গেলেই নিশেনখালির হাজরাতলা।

ইতিমধ্যে বৌটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে পাঁচুদাসীর। ওর নামটি বড় কটোমটো, মুখ দিয়ে উচ্চারণ হওয়া কঠিন—ম-ন-জু-লা। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যিনি এসেছেন উনিই স্বামী, কলকাতায় চাকুরি করেন। পয়সাওয়ালা লোক, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি আছে। বিয়ে হয়েচে আজ চার বছর, ছেলেপুলে না হওয়াতে হাজরাতলায় পুজো দিতে চলেছে ওদেরই মত।

ম-ন-জু-লা বলছে—আচ্ছা ভাই, ঠাকুর খুব জাগ্রত, না ?

—শুনেছি তো দিদি। আমারও তো সেইজন্যিই আসা। যদি উনি মুখ তুলি চান—

—আমারও তাই। তোমায় বলতে কি, সব আছে কিন্তু মনে সুখ নেই। উনি আবার এসব মানেন না, আমি জোর করে নিয়ে এসেছি। বলি চলো, পাঁচ জায়গায় দেখতে হয়—এতে আর কষ্ট কি ? আমার তো দিব্যি লাগছে ভাই। কি চমৎকার নদীর ধারটা—কলকাতা থেকে কতকাল কোথাও বার হইনি ভাই—মধুপুর যাওয়া হয়েছিল সেবার পুজোয়—দু'বছর হোল—

—সে কোথায় দিদি ? মধুপুর ?

—পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণায়। পাহাড় আছে, শালবন আছে সেখানে। বেশ ভালো জায়গা—কিন্তু এ জায়গাও আমার বেশ ভালো লাগচে—কত পাখীর ডাক! পাখীর ডাক শুনে

যেন বাঁচলাম কত দিন পরে। কেমন সুন্দর, না?

পাঁচুদাসী বৌটির কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে কৌতুক অনুভব করলে। পাখীর ডাক শুনে শুনে তার কান পচে গেল। সে আবার কি একটা জিনিস এমন তা তো জানা নেই! যত আজগুবী কাণ্ড! ভদ্রতার খাতিরে সে বল্লে—হ্যাঁ দিদি, ঠিক। চলুন আমার সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে ঝিটকিপোতায়। দিনরাত পাখীর কিচিরমিচির শোনাবো।

তারপর ওরা ব্যাং নদী জীর্ণ খেয়ায় পার হয়ে ওপারে চলে গেল। আরও কয়েক দলের সঙ্গে দেখা হোল—আশপাশের গ্রাম থেকে তারাও চলেছে, আজ মঙ্গলবারে হাজরাতলায় পুজো দিতে। গাড়ি নদীর ওপারেই রয়ে গেল। এ পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে। নদীর ধার দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা যজ্ঞিডুমুর গাছের তলা দিয়ে বনঝোপের পাশ কাটিয়ে পথ চলেছে উত্তর-মুখে—বাবলা গাছে ভর্ত্তি সবুজ মাঠের মাঝখান বেয়ে।

পাঁচুদাসীর বড় আমোদ লাগছিল। কত লোকের সঙ্গে দেখা, কত দেশ-বিদেশ। কলকাতার বৌটিকে ওর বড় ভালো লেগেছে—হোক না কটোমটো নাম, কি ভালো মেয়ে, কি মিষ্টি কথা, অমায়িক ব্যবহার।

আর একটি বৌ এসেছে। ওর নাম তারা, জাতে সদগোপ। বাড়ি বনগাঁর কাছে হরিদাস-পুর। তার ছেলে হয়ে মরে যাচ্ছে—গত পৌষ মাসেও একটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছে ওর—সেই ছেলের কথা বলে আর কাঁদে।

ম-ন-জু-লা বোঝাচ্ছে—কেঁদো না ভাই। সবই ভগবানের ইচ্ছে। আবার কোলজোড়া খোকা পাবে বই কি—এখনো তুমি ছেলেমানুষ—তাঁর নাম করে চলো, কাজ হবে ঠিক। কি বলো ভাই?

ও পাঁচুদাসীর দিকে চেয়ে শেষের প্রশ্নটা করলে। কিন্তু পাঁচুদাসীর মন তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে সেই কলুদীঘির ধারে বড় তুঁতলায়—হাতে পাকা বীজবেগুন, চাঁদমুখখানা ওর দিকে উঁচু করা, কত বিঘের ক্ষেতের বীজ!—দুহাতে ছড়ানো···ও ধন সোনামণি, তুমি আসবা, আসবা আমার কুঁড়েঘরে আমার কোলজোড়া হয়ে! আসবা আঁধার পক্ষের শেষ রাতের অন্ধকারে, পাখীপক্ষী যখন ডেকে উঠবে আমবনে, বাঁশবনে, কুল্লো পাখী ডাকবে শিমুল গাছের মগডালে বিলবাওড়ে মাছ ভেসে উঠবে কেউটে পানার দামের মধ্যি! বুড়ো হাজরার দোহাই, পেঁচোপাঁচীর দোহাই···এসো খোকা, এসো···

একজন কে বলচে—আঁচল পাততে হয় হাজরাতলায়—নদীতে নেয়ে আঁচল পেতে ঠাকুর-তলায় বসে থাকতে হয়—

পাঁচুদাসী বল্লে—কেন?

আঁচলে ফল পড়ে, ফুল পড়ে—যার যা হবে তাই পড়ে।

কথা চাপা পড়ে গেল। সবাই বলচে ওই হাজরাতলা দেখা যাচ্ছে—

ওরা পৌঁছে গেল।

নদীর ধারে মাঠের মধ্যে চারিধারে বহু প্রাচীন ষাঁড়া গাছের সারি নিবিড় ঝোপ তৈরী করেচে ওরা জড়াজড়ি করে। বেড়ার মত আড়াল করেচে···ওর ওদিকে কিছু চোখে পড়ে না। সেই ষাঁড়া ঝোপের বেড়ার ধারে একটা বড় ষাঁড়া গাছই হচ্ছে হাজরাতলা, বৃদ্ধ হাজরা ঠাকুরের স্থান।···

সেই গাছতলায় পুজোর যোগাড় হয়েছে···পুরুতঠাকুর বসে আছে। চাল, কলা, ছোলা-ভিজে, পেঁপে···ফুলের রাশ। লোকে লোকারণ্য হাজরাতলায়। দশ-পনেরোখানা গরুরগাড়ি

দাঁড়িয়ে আছে—এপার থেকে যারা এসেছে তাদের গাড়ি।

ঝাঁড়া ঝোপ ঘেরা মাঠের বাইরে দোকান বসেচে···মুড়িমুড়কি, ফুলুরি, কাটিভাজা, ছোলা-ভাজা। পিঁ-পিঁ বাঁশি বাজচে ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে···খেলনা বিক্রি হচ্ছে। মাটির ছোবা, পুতুল, রাধাকেষ্ট, শিবঠাকুর, ঘোড়া—মণিহারি দোকানে কিতে, কাঁচের চুড়ি, চিরুনি বিক্রি হচ্ছে ···দু'তিনখানা দোকানে পাঁপর ভাজা হচ্ছে। তেমনি খদ্দেরের ভিড়—বেশির ভাগ ছোট ছেলেমেয়ে আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা। আশপাশের গ্রাম থেকেও অনেক ঝি-বৌ বিনা কারণেই পুজো দেখতে এসেচে হাজরাতলায়।

বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে। পুজোর বাজনা বেজে উঠলো।

পুরুতঠাকুর বল্লেন—যাও মা-ঠাকরুণরা স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে সব হাজরাতলায় আঁচল বিছিয়ে বসো—

কলকাতার বৌটি আর পাঁচুদাসী একসঙ্গে নেয়ে উঠলো নদী থেকে। এক নিঃশ্বাসে ডুব দিতে হবে, উত্তর মুখ হয়ে হাজরা ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে হবে।

ম-ন-জু-লা চুপি চুপি বল্লে—ভাই, আমার বুক কাঁপচে।

—কেন দিদি?

—আমার বড় সাধ—তোমাকে বলচি ভাই। বুকখানা হুহু করে মাঝে মাঝে। আমার সঙ্গে আমার সমবয়সী যাদের বিয়ে হয়েছিল, সবার একটি দুটি সন্তান হয়ে গিয়েচে—ওঁর মনে বড় কষ্ট—

—বাবার দয়া দিদি। হয়ে যাবে, চলো শীগগির করে যাই—

পাঁচুদাসীর বড় মায়া হয় বৌটির ওপর। কি চমৎকার মানিয়েছে ওকে নীল রং-এর ফুল তোলা ভিজে শাড়ি পরে···দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অনেকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিলও ওকে · সুন্দরী বটে··· পাড়াগাঁয়ের হাটে-মাঠে অমন সুন্দরী মেয়ে চক্ষে পড়ে কখনো? আহা, মোমের গড়ন হাত দুটি কখনো কি গোবরের ঝুড়ি ধরতে পারবে? গড়ে ধান ভেনে দিতে পারবে —আঙুল ছেঁচে যাবে তা হোলে। ও-হাত ধান ভেনে দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়নি।

অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ জন বৌ, সবাই তরুণী, ভিজে কাপড়ে সারি বেঁধে হাজরাতলায় দাঁড়িয়ে। পুরুতঠাকুর সকলের মাথায় কুশিতে করে জলের ছিটে দিয়ে বল্লেন—যাও সব মায়েরা, এইবার আঁচল পেতে বসো গে—

একজন বল্লে—কতক্ষণ বসে থাকবো বাবাঠাকুর?

—চোখ বুজে বসবে সবাই। যতক্ষণ না আঁচলে কিছু পড়ে ততক্ষণ বসবে মা তোমরা। চোখ চেও না কেউ, আসন ছেড়ে উঠে পড়ো না যেন অধৈর্য্য হয়ে।

চৈত্র মাসের খর রোদে মাঠ তেতে উঠেচে—বাতাস যেন আগুনের হলকা, তবুও হাজরা-তলায় বেশ ছায়া আছে তাই রক্ষে—পাঁচুদাসীর জলতেষ্টা পেয়েচে। জল খাওয়ার কথা এখন ভাবতে নেই। বুড়ো হাজরা দয়া করুন। ঢোল বাজচে কাঁসি বাজচে। ট্যাং ট্যাং ট্যাং—কাঁইনানা, কাঁইনানা,···না, ও সব ভাবতে নেই···হাজরাঠাকুর অপরাধ যেন না নেন। পাঁচু-দাসী আবার মনকে স্থির করবার চেষ্টা করল।

কতক্ষণ কেটে গেল।

পাঁচুদাসী এর মধ্যে বার তিনেক চোখ চেয়ে দেখেচে। আশপাশে হাজরাঠাকুরের কোন মন্দির বা মূর্ত্তি নেই। একটা মস্তবড় ঝাঁড়া গাছ অনেকদূর জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় ছড়িয়ে পড়া শুকনো পাতার উপর তরুণী বৌয়ের দল চোখ বুজে আঁচল বিছিয়ে

বসে···কোনো লোক নেই এদিকে···পুরুতঠাকুর রয়েছেন দূরে ও গাছের তলায় পুজোর জায়গায়। ও ভাল করে চেয়ে দেখলে গাছতলায় একখানা সিঁদুর মাখানো ইট পর্য্যন্ত নেই।

পাঁচুদাসী আবার চোখ বুজলো।

হঠাৎ ওদের সারিতে একটি বউ অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলো—আমার আঁচলে একটা কি পড়লো!

পাশের একজন উপদেশ দিল—চোখ চেয়ে ছাখো না কি!

একটা ষাঁড়া কল।

বৌটি সারি থেকে উঠে চলে গেল পুরুতঠাকুরের কাছে, যেখানে পুজো হচ্চে। সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো পাঁচুদাসীর এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকও কেঁপে উঠলো। কি জানি ভাগ্যে কি আছে!

আরও দুটি বৌ সারি থেকে উঠে চলে গেল—একজনের ফুল আর একজনের ফল পড়েচে। ইতিমধ্যে আর একজন কেঁদে উঠলে ডুকরে। সবাই বল্লে—কি হোল গো, কি হোল?

—আমার আঁচলে চুল আর ঢিল পড়েছে গো। পোড়া কপাল গো!

সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে গেল সারি থেকে। বুড়ো হাজরা নিষ্ঠুর, দয়া করলেন না তার উপর। কি অপরাধ হোল বাবার চরণে! পাঁচুদাসীর বুক কেঁপে ওঠে আবার। বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। একটা বৌ ঢিপঢিপ করে মাথা কুটছে মাটিতে ওর সারিতে। ওর আঁচলেও তাহলে চুল আর ছাই পড়েছে।

দয়া করো বাবা হাজরা, বুড়ো হাজরা দয়া করো!

বেলা ঘুরে গিয়েছে। আরও কতক্ষণ কাটলো। হঠাৎ পাঁচুদাসীর বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হবার উপক্রম হোল। টপ করে একটা কি পড়লো ওর আঁচলে! ফল? ষাঁড়া ফল? চুল বা ছাই পড়বার শব্দ কি অমন! ঢিল!

···বাবা হাজরাঠাকুর!

সবাই মিলে ব্যাং নদীর খেয়া পার হচ্ছে। উদ্ধব দাস স্ত্রীকে বল্লে—তুই কি পেলি?

পাঁচুদাসী বল্লে—ফল, একটা ষাঁড়া কল। হাজরাঠাকুরের দয়া গো—

ওর মন ভালো না। ম-ন-জু-লা ফিরে গিয়েছে আগের খেয়ায়। ও পেয়েছিল জট-পাকানো চুলের নুড়ি। পুরুতঠাকুর আর একবার বসতে বলেছিলেন আঁচল পেতে। আবারও সেই চুলই পড়েছে তার আঁচলে। পুরুতঠাকুর বলেছেন—মা, আমি কি করবো, আমার ওতে হাত নেই। তোমার অদৃষ্টে সন্তান থাকলে ফুল-ফলই পড়তো—বাড়ি ফিরে যাও মা—কি করবো বলো—

ম-ন-জু-লার কান্না দেখে ওর নিজের চোখে জল এসেছিল। সত্যি, কত আশা করে এসেছিল! হাজরাঠাকুর কি করবেন? যা অদৃষ্টে আছে তাই তিনি বলে দেবেন মাত্র। বেচারী ম-ন-জু-লা! অত টাকা ওদের!

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে ব্যাং নদীর পশ্চিম গায়ে বনজাম আর হিজল আর বেত ঝোপের আড়ালে। পাঁচুদাসীর মন আনন্দে ভরে উঠলো হঠাৎ। খোকা আসচে, হাতে তার বীজবেগুন, কত ক্ষেতে ক্ষেতে শক্ত হাতে সে লাঙ্গল দেবে, বেগুনের চারা তুলে পুঁতবে হাপর থেকে, সোনা ফলাবে মাটির বুকে। বুড়ো হাজরা বলবার আগে স্বপ্ন দেখেছে তার আসবার। সে আসচে।

কাশী কবিরাজের গল্প

আমার উঠোন দিয়ে রোজ কাশী কবিরাজ একটা ছোট ব্যাগ হাতে যেন কোথায় যায়। জিগ্যেস করলেই বলে—এই যাচ্চি সনেকপুর রুগী দেখতে, ভায়া—

একদিন বল্লে—নৈহাটি যাচ্চি রুগী দেখতে, সেখান থেকে শ্যামনগর যাবো।

—সেখানে আপনার রুগী আছে বুঝি ?

—সব জায়গায়। কলকাতায় মাসে দুবার যাতি হয়।

আমার হাসি পায়। কাশী কবিরাজ আমাদের গ্রামে বছর খানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসে বাসা করেছে। জঙ্গলের মধ্যে একখানা দোচালা ঘর। আমগাছের ডালপালায় ঢাকা। দিনে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে না। ছেঁড়া কাপড় পরে কাশী কবিরাজের বৌকে ধানসেদ্ধ করতে দেখেছি। এত যদি পসার, তবে এমন অবস্থা কেন ?

একদিন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আকাশে ঘন মেঘ এসে জমলো। বৃষ্টি আসে-আসে। কাশী কবিরাজ দেখি আমার উঠোন দিয়ে হনহন করে চলেচে ব্যাগ হাতে।

ডেকে বল্লাম—ও কবিরাজ মশাই—শুনুন শুনুন, কোথায় চল্লেন ? বৃষ্টি আসচে—

কাশী কবিরাজ আমার চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠে বসলো।

বল্লে—একটু রাণাঘাট যাতাম এই ট্রেনে, রুগী ছেলো।

—কে রোগী ?

—একজন মাদ্রাজী। পা ফুলে বিরাট হয়েচে, সব ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। তিনবার এক্স্-রা কত্তি গিয়েলো। আমি বলিচি, ওসব এক্স্-রা টেক্স্-রা আমার সঙ্গে লাগবা না। আমার মুখই এক্স্-রা—

আমার হাসি পেলো। নিজের যদি অত গুণ, তবে দোচালায় বাস কর কেন জঙ্গলের মধ্যে ? লম্বা লম্বা কথা বল্লেই কি লোকে তোমাকে বড় কবিরাজ ভাববে ?

—একটু চা খান, দাদা—

—তা খাওয়াও ভাই, বৃষ্টি এলো। একটু বসেই যাই—

—আপনার পসার তাহোলে বেশ বেড়েচে ?

—বাড়বে কি ভায়া, বরাবর আছে। আমার তান্ত্রিক কবিরাজি। যা কেউ সারাতি পারবে না, তা আমি সারাবো।

—বলেন কি !

—এই জন্যেই তো আমার পসার। শুধু ঝাড়ানো—ঝাড়ানো—

—ঝাড়িয়ে রোগ সারিয়েছেন ?

—আরে এ পাগল বলে কি ? বড় বড় রোগ ঝাড়িয়ে সারিয়েছি।

—বটে !

—তোমরাই ইংরাজি লেখাপড়া জান কিনা,—সমস্ত অবিশ্বাস করো জানি। ভূত মান ?

এই রে ! ঝাড়ফুঁক থেকে এবার ভূতপ্রেতে এসে পৌঁছুলো ! কাশীনাথ কবিরাজ অনেক কিছু জানে দেখছি। বল্লাম—যদি বলি মানিনে ?

—তা তো বলবাই, ইংরাজি পড়াতে তোমাদের ইহকালও গিয়েচে, পরকাল গিয়েচে !

রাগ করো না ভায়া। যা সত্যি, তাই বল্লাম। চা এসেচে? তাহলি একটা গল্প শোনো বলি। আমার নিজের চোখে দেখা।

খুব বৃষ্টি এসে পড়লো, চারিদিক অন্ধকার করে এলো। কাশীনাথ কবিরাজ তার গল্প আরম্ভ করলো।

কাশীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক-মতে চিকিৎসা করে ব'লে অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসে। আজ বছর দশেক আগে হরিহরপুরের জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ি থেকে তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্যে কাশীনাথের ডাক এলো।

আমি বল্লাম—আগে কখনো সেখানে গিয়েছিলেন আপনি?

—না।

—নাম জানতেন?

—খুব। আমাদের ওদেশে হরিহরপুরের জমিদারের নাম খুব প্রসিদ্ধ।

—যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেলা কত?

—সন্দের কিছু আগে। তারপর শোনো—

কাশীনাথ ওদের বাড়ি দেখে অবাক্ হয়ে গেলো। সেকেলে নামকরা জমিদার, মস্ত বড় দেউড়ি, দু-তিন মহলা বাড়ি। দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে একটা বড় বারান্দা। ওদিকে ঠাকুর-দালান, বাইরে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। তবে এ সবই ভগ্নপ্রায়—পূর্ব্বের সমৃদ্ধি ঘোষণা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। বড় বড় বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে বাড়ির গায়ে। মন্দিরের চূড়োর কাটলে বন্য শালিখের গর্ত্ত, কাঠবিড়ালির বাসা। সামনে বড় একটা আধ-মজা দীঘি পানায় ভর্ত্তি।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই মস্ত বড় পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখে কাশীনাথের মনে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাব হোল।

আমি বল্লাম—কি ভাব?

—সে তোমারে বলতে পারিনে, ভায়া। ভয়ও না, আনন্দও না। কেমন যেন মনে হোল, এ বড্ড অপয়া বাড়ি—এ ভিটেতে পা না দেওয়াই ভালো আমার পক্ষি। তোমার হবে না, কিন্তু আমার হয় বাপু, এমনি।

—অন্য কোথাও হয়েচে?

—আরও দু-একবার হয়েচে এমনি। কিন্তু সে কথা এখন আনবার দরকার নেই। তারপর বলি শোনো না—

তারপর কাশী কবিরাজ সেখানে গিয়ে রোগী দেখল। দশ বৎসর বয়সের একটি ছেলের টাইফয়েড জ্বর, খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। কাশী কবিরাজ গিয়ে তান্ত্রিক প্রণালীতে ঝাড়-ফুঁক করে শেকড়-বাকড়ের ওষুধ বেটে খাওয়ালো। রোগী কথঞ্চিত সুস্থ হয়ে উঠলো।

অনেক রাত্রে কাশী খাওয়া-দাওয়া সেরে দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখলো, সেখানে তার জন্যে শয্যা প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট শয্যা, দামী নেটের মশারি, কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা আছে, ডিবের বাটিতে পান,—সব ব্যবস্থা অতি পরিপাটী।

আমি বললাম—বড়লোকের বাড়ির বন্দোবস্ত—

—হাজার হোক, বনেদী ঘর তো? যতই অবস্থা খারাপ হোক, পুরনো চাল-চলন যাবে কোথায়?

—তারপর?

কাশী কবিরাজ বেশিক্ষণ শোয়নি, এমন সময় সে দেখল ঘোমটাপরা একটি বৌ হনহন করে মাঠের দিক থেকে এসে দেউড়ির মধ্যে দিয়ে জমিদার-বাড়ি ঢুকচে। কাশী খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলো। এত রাত্রে বাইরের মাঠ থেকে এসে বাড়ি ঢুকলো কে? ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী বধূ বলেই মনে হলো, যতটুকু দেখেছে তা থেকেই।

যাক্। সে এসেছে কবিরাজি করতে, অতশত খোঁজে তার কি দরকার? যে যা ভালো বোঝে করুক।

আমি বল্লাম—রাত তখন কত?

—রাত একটার কম নয়, বরং বেশি।

—যেদিক থেকে এলো, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই?

—না মশাই। ফাঁকা মাঠ অনেকখানি পর্য্যন্ত, তারপর কোদালে নদী। কোদালে নদীতে গরমকালে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়—তার ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

—আপনি কি করে বুঝলেন ভদ্রবংশের মেয়ে?

—হাত-পায়ের যতটুকু খোলা, ধবধবে ফরসা। আধ-জ্যোৎস্না রাত, আমি দিব্যি টের পাচ্ছি—মুখখানা অবিশ্যি ঘোমটায় ঢাকা ছেলো।

—বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় অন্য কোনো লোক সেখানে ছিলো?

—না।

—আপনাকে টের পেয়েছিলো?

—কোনদিকে না চেয়ে হনহন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাশী কবিরাজ নির্ব্বিরোধী ভাল লোক, সে জলের গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম আর আসে না, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। লোকে বাড়িতে চিকিৎসক ডাকে ঘুমুবার জন্যে নয়। কাশী কবিরাজ অভিজ্ঞ লোক, দায়িত্ব-বোধ তার যথেষ্ট, সে অবস্থায় তার চোখে ঘুম আসে কি করে?

মিনিট খানেক পরে কাশী হঠাৎ দেখল, সেই বৌটি তার পাশের দেউড়ি দিয়ে আবার বার হয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে তড়াক করে উঠে পড়ল। বৌটি ক্রমে দূর মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কাপড় দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বল্লাম—মাঠের দিকে গেলো একা?

—একদম একা। আর অত রাত!

—আপনি কি ভাবলেন?

—আমি আর কি ভাববো মশাই, একেবারে অবাক্। এত রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়ে এমন ভাবে যে নির্জ্জন মাঠের দিকে চলে যেতে পারে, তা কখনো দেখিওনি।

কাশী কবিরাজ সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে বল্লে—শীগ্‌গির আসুন, কবিরাজ মশাই, রোগী কেমন করচে।

কাশী গিয়ে দেখে, রোগীর অবস্থা সত্যই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ এত খারাপ হওয়ার কথা তো নয়। যাহোক, তখনকার মত ব্যবস্থা করতে হোলো। অনেকক্ষণ খাটুনির পরে রোগী খানিকটা সামলে উঠলো। তখন আবার এসে শুয়ে পড়লো কাশীনাথ বাইরের দেউড়ির ঘরে।

পরের দিনমান রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকেই চললো। জমিদারবাবুর মন বেশ ভালো—প্রথম দিন বড়ই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। এমন কি কবিরাজের সঙ্গে বসে দুপুরের পর খানিকক্ষণ পাশাও খেললেন। কবিরাজকে তাঁদের বড় দীঘিতে একদিন মাছ ধরতে যাবার

আমন্ত্রণও জানালেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও দুপুরে বেশ ভালোই হোল—মাছের মুড়ো, দই, দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি। কবিরাজ খুব খুশী···। জমিদারবাবু বেশ প্রফুল্ল।

সেই রাত্রে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো। এমন ধরনের ব্যাপার কাশী কবিরাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রোগীর অবস্থা ভালো থাকার দরুন সেদিন আর বেশি খাটুনি ছিলো না। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শয্যা আশ্রয় করলো কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হোতে লাগলো। কোথাকার ঘড়িতে একটা বেজে গেলো ঢং করে। ঠিক সেই সময়ে দেখলো কাশী কবিরাজ, সেই ঘোমটাপরা বৌটি দেউড়ি দিয়ে ঢুকে অন্দরের দিকে চলেছে।

বলতে কি কাশী কবিরাজের বড় বিস্ময়বোধ হোল। কি সাহস মেয়েটার! এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে ভয়ও কি করে না?

মিনিট পনেরো কেটে গেলো, কি বিশ মিনিট। তারপর কাশী কবিরাজকে আশ্চর্য্য স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই বৌটি ওর ঘরে এসে ঢুকলো। আমি বল্লাম—আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে।

—ঘরে আলো ছিলো?

—বাড়ীতে রোগী থাকার দরুন আমার ঘরে সারারাতই একটা হ্যারিকেন জ্বলে।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মুখের ঘোমটা অনেকখানি তুলে কবিরাজের দিকে চাইলো। বেশ সুন্দরী মহিলা। দেখলে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়, এমনি চেহারা। কাশী কবিরাজকে বল্লে—তুমি এখানে থেকো না, চলে যাও এখানে থেকে।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত কাশী কবিরাজ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আপনি কে মা?

—আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

—মা, আমি চিকিৎসক। রুগী দেখতে এসেচি। আমার কাজ না সেরে আমি কি করে যাবো?

—তুমি এ রুগী বাঁচাতে পারবে না। কাল সকালে তুমি চলে যাও এখান থেকে—

—কি করে আপনি জানলেন রুগী বাঁচবে না!

—আমি ওর মা। ওর সৎমা ওকে খুব কষ্ট দিচ্চে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারচিনে—আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেচি—নিয়ে যাবোই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না—

কাশীনাথ কবিরাজ তখনো ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেনি। সে আমতা-আমতা করে বল্লে—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি মারা যাওয়ার পরে আজ চার বছর হোল ওর বাবা আবার বিয়ে করেচে। আমার সেই সতীন ওকে বড় যন্ত্রণা দিচ্চে। আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না—খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই—ওকে আমি নিয়ে যাবোই। তুমি কেন অপযশ কুড়োবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—

কাশীনাথের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছে যেন। কি ব্যাপারটা সামনে ঘটেচে, তার যেন কোনো ধারণাই নেই, তবুও সে হাতজোড় করে বল্লে—মা, একটা কথা। আমি জমিদারবাবু আপনার স্বামীকে সব বলি। তিনি তাঁর ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন। ছেলেটিকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে, সেটা তো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

বৌটি বললেন—তাঁর এ পক্ষের ছেলেমেয়ে হবে। তাঁদের নিয়ে থাকবেন তিনি—

—ও কথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে চিন্তা করবে? সব

দিকে বুঝুন। তাঁর কথা ভাবতে হবে আপনাকেই। আমি আজই সব বলচি তাঁকে খুলে। যদি তিনি তাঁর এ পক্ষের স্ত্রীকে ব'লে ছেলেটির ওপর অত্যাচার নিবারণ করতে পারেন, তবে আপনি আমাকে কথা দিন, ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না? আমি সে চেষ্টা করি, মা?

—করো।

বলেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হোল না কিন্তু। ঘর থেকে বার হয়ে দেউড়ি দিয়ে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গিয়ে নিশীথ-রাত্রির শুভ্র-জ্যোৎস্নার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

আমি জিগ্যেস করলাম—বলেন কি!

—হ্যাঁ মশাই।

—আচ্ছা, এ মূর্ত্তির কোনো অংশ অস্পষ্ট নয়?

—দিব্যি মানুষের মত। কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই কোথাও। কথাবার্ত্তা বললাম, আমার কোনো ভয় হোল না। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলচি, তেমনি মনে হোল।

মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হওয়ার খানিক পরেই বাড়ির মধ্যে থেকে কাশীকে ডাকতে এলো। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। অথচ সমস্ত দিন এমন ভালো ছিলো। তখনকার মত সুব্যবস্থা করে ভোরের দিকে কাশী কবিরাজ জমিদারবাবুকে বল্লে—আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

আমি বল্লাম—বাইরে এসে সব কথা বল্লেন নাকি?

—হ্যাঁ, গোড়া থেকে। বল্লাম, এই আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—বিশ্বাস করলেন?

—কেঁদে ফেললেন। বল্লেন,—আমি জানি। আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি।

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত।

জমিদার বল্লেন, আমি জানি, ওর সৎমা ওর ওপর খুব সদয় নয়—তবে এতটা আমি জানতাম না। আমি কথা দিচ্চি, খোকা সেরে উঠলে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাবো। এ সংস্রবে আর আনবো না। আমার এ স্ত্রীকেও আমি শাসন করচি। আপনি তাঁকে জানাবেন। রাত ভোর হয়ে গেলো।

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠতে লাগলো। এগারো দিনের পর কাশী কবিরাজ পথ্য দিলেন তাঁর রোগীকে।

বল্লাম—ওর মাকে আর দেখেননি? আসেননি আপনার কাছে?

—না!

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে

শহর বা তীর্থের জাঁকজমক গোলমাল আমার ভালো লাগে না। আমি চিরদিন নির্জ্জন ভালোবাসি। তাই পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল দেখে বেড়াই। বনে-জঙ্গলে ভগবানের সৃষ্টির কি সৌন্দর্য্যই না দেখি!

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস,—আমি তখন ঘাটশীলায়। ছোটনাগপুরের জঙ্গল দেখবার

সাধ হোল। মিস্টার সর্দার সিংও রাজী হলেন। আর দেরি নয়—দুজনে বেলা তিনটার ট্রেনে ঘাটশীলা ছেড়ে চক্রধরপুরে এলুম। রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে দুজনে চললুম হরদয়াল সিং-এর বাড়ি—সেখানে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রেস্তোরাঁতে গিয়ে দুজনের রাত্রিযাপন।

সকালে হরদয়াল সিং-এর বাড়ি থেকে এলো ক্ষেত থেকে সদ্য তোলা মূলো—চায়ের সঙ্গে সেই মূলো খেয়ে দুজনে মোটরে করে বেরিয়ে পড়লুম। ভগবানের অসীম দয়া—তাই এমন সব বন্ধু পেয়েচি। না হলে এমন আরামে আমাকে জঙ্গলে নিয়ে যেতো কে? এলুম চাঁইবাসায়।

চাঁইবাসা জায়গাটি বেশ পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি হ্রদ আছে। তেমন বড় না হোলেও ভারি সুন্দর। উঁচু-নীচু পথ—চমৎকার বাঁধানো। পথের একদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, আর একদিকে টানা জঙ্গল। সরকারী ফরেস্ট। এ জঙ্গলে ছোটখাটো জীবজন্তু আছে। পথে সঞ্জয় নদী। নদীর উপর প্রকাণ্ড পুল। পার হয়ে জঙ্গলের পথে ষোল মাইল আসবার পর শলাই বাংলো। দু-বছর আগে এখানে এসেছিলুম। বাবলুর মা রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেকথা মনে পড়লো।

পাশে ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম বাকৈলা। বাকৈলায় হপ্তায় দু-দিন হাট বসে—নানা জিনিস বিক্রি হয়। এ হাটে বাবলুর মা একখানি চাদর কিনেছিলেন—এখানকার তৈরী চাদর। জঙ্গলের দৃশ্য এখানে অদ্ভুত—অপরূপ সৌন্দর্য্য। নিস্তব্ধ বনভূমি—যেন সৌন্দর্য্যের পশরা উন্মুক্ত করে রেখেছে। যাকে বলে ভীমকান্তি দৃশ্য।

বাকৈলায় পৌঁছুলুম বেলা তখন একটা। ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো আছে। সেখানে উঠলুম। সঙ্গে খাবার-দাবার ছিল—খেয়ে একটু বিশ্রাম করে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে বেরুলুম জঙ্গল দেখতে। বহুদূর চলে গেলুম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো—চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। আকাশে একটুখানি চাঁদ গাছপালার আড়ালে কোথায় লুকিয়ে আছে, দেখা যায় না। পৃথিবীর মাথার উপর আকাশ যেন নীল চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে—আকাশের গায়ে অপূর্ব্ব নক্ষত্রশ্রেণী! মনে হচ্ছিল—যেন আকাশে দেওয়ালির দীপ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করেছিলুম। মনে হচ্ছিল, ভগবানের কি মহাশিল্প এই পৃথিবী! বাবলুর কথা মনে হোল—তার যেন চোখ খোলে। সে যেন ভগবানের এ শিল্প চোখে দেখতে পায়।

বাংলোয় ফিরলুম খানিক রাত্রে। পরের দিন সকাল আটটায় আবার বেরুলাম জঙ্গলের পথে। দুধারে কি ঘন জঙ্গল—আর গাছে গাছে কত রকমের লতাপাতা! গাছপালার আড়ালে ওদিকটা যেন লুকোনো আছে। পথ-চলা পথিক পথে যেতে যেতে জঙ্গলের সব ঐশ্বর্য্য দেখে যাবে, সে উপায় নেই। সে ঐশ্বর্য্য পুরোপুরি দেখতে হলে পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে। কত রকমের গাছ—কত রকমের ফুল! দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে—পিটুনিয়া ফুটেচে। নভেম্বর মাস—জায়গাটা আশ্চর্য্যরকম ঠাণ্ডা। করম, কভিলা, শাল, পিয়াশাল প্রভৃতি গাছ-গাছড়া, বুনো কলা আর বুনো বাঁশ গাছ প্রচুর। দেখতে দেখতে কুরো নদীর ধারে এসে বসলুম। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটা স্টেশন। খানিকক্ষণ বসবার পর মোটরে চড়ে খাজুড়িয়া হয়ে একটা গ্রামে এলুম। গ্রামে হো-দের বাস—সকলেই খৃষ্টান। মেয়েদের মাথায় লাল কিতা বাঁধা—সকলেই কাজকর্ম্ম করচে। এখানে এক পাদ্রী আছেন, তাঁর নাম ধনকুমার হো। তাঁর সঙ্গে খানিক আলাপ করে বাংলোয় ফিরলুম, বেলা তখন একটা। স্নানাহার সেরে শুয়ে পড়লুম। শোবামাত্র নিদ্রা।

ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি, বেলা পড়ে এসেচে। বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। বারান্দায় সামান্য রোদ পড়েচে। সামনে পাহাড়ের শ্রেণী—সে-সব পাহাড়ের গায়ে রাঙা রোদ। বসে বই

পড়তে লাগলুম—"রেজার্স এজ"। পড়তে পড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে চারিদিক বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। তখন ঘরে এলুম। ঘরে আগুন জ্বালা হয়েচে—আগুনের পাশে বসে আবার বই পড়া। প্রেমচাঁদের গল্পের বই। বই শেষ করে খাওয়া-দাওয়া। তারপর অনেক রাত্রে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখি বনের কি শোভা! আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। তারার ঝিকিমিকি আলোয় নিস্তব্ধ বনভূমি দেখাচ্চে যেন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। আর কোন কথা নয়। মন কেবলি বলে ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

বিকেলে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে গৈলকেরা গ্রামে বেড়াতে বেরুলুম। ঘুরে ঘুরে সব দেখে গ্রামের পিছনে একটা ডুংরীর উপরে উঠে বসলুম—সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্চে—কি চমৎকার দেখাচ্ছিল! এমনি সুন্দর জায়গা আর এমনি সুন্দর দৃশ্যের ছবি কত কল্পনা করেচি, কিন্তু কল্পনায় এ দৃশ্য কোনোদিন ধরতে পারিনি—ভগবান আজ সে ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তুললেন। ডুংরীতে বসেই বাড়িতে চিঠি লিখলুম।

আকাশে অগণ্য নক্ষত্র—শাল বনস্পতির মাথায় অনেক রাত্রেও জ্বলজ্বল করচে অগণিত তারা। সেই শালবনে বসে ভগবানের এই অপূর্ব্ব বিশ্ব-সৃষ্টি দেখে মনে মনে কেবলি বলতে লাগলুম, বাবলু বড় হয়ে যেন এ শিল্প দেখে—দেখে উপভোগ করে।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটরে চড়ে পাল্টু-বাংলোর উদ্দেশে যাত্রা। পথে সরকারী ফরেস্ট—দু'তিনটে বাংলোও দেখা যায়। কি ঘন জঙ্গল! ছোটনাগপুরে বহু জঙ্গল দেখেচি—কিন্তু গৈলকেরার মত এমন ভীষণ জঙ্গল আর কোথাও দেখিনি। জঙ্গলে প্রচুর শালগাছ—জঙ্গলে কাঠুরেরা আসে কাঠ কাটতে। বাঘের কবলে অনেকে মারা যায়। এখান থেকে চার মাইল দূরে সারেন্দা-টানেল। শুনলুম, বিশ-পঁচিশ বছর আগে সেখানে এক প্রকাণ্ড বুনো হাতীর সঙ্গে বি-এন-রেলওয়ের একখানা চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ হয়—হাতীটাই জখম হয়ে শেষে মারা যায়।

যেতে যেতে জঙ্গলের প্রান্তে কাঠবোঝাই কখানা গোরুর গাড়ি দেখলুম। সার চলেচে। আরো খানিক এগিয়ে দেখি, পথের ধারে তিনটি ময়ূর—বন থেকে বেরিয়ে পথে এসেচে। আমাদের দেখে, চলন্ত মোটর দেখে তারা সরে গেল না। এমন নির্ভয়! পথে কারো নদী পার হলুম—তারপর কোইনা পার হয়ে শলাই-বাঙলোয় পৌঁছুলুম। খানিকটা বিশ্রাম করে চা-টা খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বেড়াতে বেরুলুম। এক জায়গায় একটা নালা। নালার উপর রেলওয়ে-ব্রিজ। ছোট লাইন—কোন মাইনিং ফার্ম আচে, তাদের প্রাইভেট লাইন। লাইনে দুজনে বসলুম—কি চমৎকার দৃশ্য! দুধারে পাহাড়—বন-জঙ্গলে আগাগোড়া ঢাকা লাইন থেকে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত—লাইনকে যেন উঁচু পাঁচিলের মত ঘিরে রেখেচে। জঙ্গলের গাছে গাছে পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলচে—আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-চাঁদ। ভগবানের উদ্দেশে দুজনে প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করলুম।

রাত্রি বাড়চে দেখে মিস্টার সিং বল্লেন—এবার ওঠা যাক। আমার উঠতে ইচ্ছা হয় না। আমি বল্লুম—এইখানে পড়ে থাকা যাক সারা রাত। মিস্টার সিং বল্লেন—সর্ব্বনাশ! ঐ জঙ্গলে আছে কত বুনো হাতী, হায়েনা আর বাঘ—নরখাদক বাঘ। তিন-চার দিন হলো, মাইনিং কোম্পানির তিনজন কুলি এখানে কাজ করছিল—তাদের—তিনজনকেই বাঘে নিয়ে গেচে। কদিন তাই কাজ বন্ধ আচে। শুনে গা ছমছম করে উঠলো।—থাকতে ভরসা হলো না। নদীর ধার দিয়ে চলে আসছিলুম—মিস্টার সিং দেখালেন, নদী-কিনারায় ভিজা বালিতে হাতীর পায়ের দাগ—হায়েনার পায়ের দাগ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন শোভা এমন

সৌন্দর্য্য—তার পিছনে মৃত্যুর এ কি করাল ছায়া!

পরের দিন মোটরে চড়ে আবার যাত্রা। পথে এক জায়গায় দেখি, উঁচু একটা স্তম্ভ। স্তম্ভের নীচে গাড়ি থামিয়ে নামা হোল। নেমে উপরে ওঠা। শৈলমালায় ঘেরা একটি টিলার উপরে স্তম্ভ। উঠবার সিঁড়ি আছে—বরাবর। মিস্টার সিং বল্লেন,—আপনার জন্যই কারা ওই টাওয়ারে ওঠবার সিঁড়ি তৈরী করে রেখেছে! সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উপরে উঠলুম। উপর থেকে কতদূর পর্য্যন্ত দেখলুম! বেশ উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। সিং বল্লেন—শশাংদাবুরু পাহাড়—তিন হাজার ফুট উঁচু! বসে বসে দেখচি আর দেখচি। মনে হচ্চে কোথায় থাকি—আর কোথায় এসেচি আজ! কি সুন্দর জায়গা! সত্যিই চোখে দেখচি? না, স্বপ্ন?

ক্রমে চাঁদ উঠলো—আকাশের পটে রাশি রাশি নক্ষত্র। ভয় হলো বিরাটত্বের রূপ দেখে। নীচে লৌহ-প্রাচীরের মত শৈলমালা—ঘন অরণ্য—মাথার উপর অগণ্য সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা। বিশ্বরূপের বিরাটত্ব বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করলুম। মনে মনে ভাবলুম, তোমার এ রূপ দেখার সুবিধা আর সৌভাগ্য কাবলু যেন পায়, হে ভগবান!

মায়া

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই। দুঃখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবার দোকান এ পর্য্যন্ত এ-সব অজ পাড়া-গাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালো-বাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণ ভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হোল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হোল কিন্তু পেট সমানে জ্বলচে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

আমি বল্লাম,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্চি। আপাততঃ বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বল্লে—রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্চি।

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বল্লে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্ত্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা।

এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বল্লাম—থাকতে পারি!

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুনীর কাজ।

—যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজী হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারি খুশী হোল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বল্লে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরি মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শুরু হোল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরোনো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল। কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্চে। আমায় বল্লে—চা করতে জানো? একটু চা করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বল্লে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলু ভাতে ভাত,—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে।

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্ব্বদা আলো জ্বেলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলচি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা রোয়াক, রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধু হাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো, একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাত দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে

তুলচে! দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছন ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বল্লে—ঝিঙে পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কোথায়?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষমানুষ?

—না, একটি বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বল্লে—কোথায় বৌ? চলো দিকি দেখি!

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বল্লে—কৈ বৌ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও ঝোপটার কাছে।

—হুঁঃ, যতো সব! চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে চুরির কথা তুললে। বল্লে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব আমি দেখতে পাচ্চি, এমন কি ঝিঙে-চুরি-করা বৌকে পর্য্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি?

বুড়ো বল্লে—না, না, সন্ধ্যার পর সর্ব্বদা আলো কাছে রাখবে।

—কেন?

—তাই বলচি। তোমার বয়স কত?

—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।

—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষট্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিস-পত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্চে। ভারী জিনিস সরাচ্চে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিসপত্র গোছাচ্ছে! কিন্তু এত রাত্তিরে?

বাবাঃ! কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বল্লে—আমি?

—হ্যাঁ, অনেক রাতে।

—ও! হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।

—আমাকে বল্লেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!

চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মত থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখাশুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—

—কি?

চক্কত্তি-বুড়ো অকারণে সুর খাটো করে বল্লে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইলো তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল।' আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্য রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!

বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবো বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁখানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্চে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।

—নিবারণ চক্কত্তির? কেন?

—দেখাশুনো করি। কাল এসেচি।

—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল। ওরা নিজেরাই থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে। অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে

যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্ত্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই লোকটার ভয়-দেখানো কথাবার্ত্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্কত্তি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালার কল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে—বেশ মোটা ধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটা ধারার। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কত্তি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্কত্তি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে দিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে, সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হাঁ, স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়! আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়?

সে-রাত্রে সেই পর্য্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কাজ-কর্ম্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জ্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে এত কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেমে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোন ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ি, আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝচি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্ত্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্ত্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়েবাড়িতে ঘর-ভর্ত্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল! মনের সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল!

এর পর ন'দিন আর কোনো কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না, কি শুনতে কি শুনেচি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল! সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই, আর শুধু ঘুমুই। কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই—কেমন একরকমের কুড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণতঃ খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েচে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্নাঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে; কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল, সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেচে। নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক —আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম— কৈ, একটা দরজা-জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্দ্রা এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েচে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে। সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নেত্য! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হল্লা!

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতন ভাবে জানলার বাইরে জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে কে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পরম আরামে

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছি ?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েছি, তা কোথা থেকে এলো ? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েচে।

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো ! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বল্লে—কি রকম আছো ? বলি, কিছু দেখচো নাকি ?

—না।

—শুনচো কিছু ?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক-তাক জানো নাকি ? ভূতের মন্তর ?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন ছাখোনি ? বৌ-মত ? কোনো গন্ধ পাওনি ?

—কিসের গন্ধ ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকতো, তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মারা যেতো। দুটি লোকের এই রকম হয়েচে এ পর্য্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয়ে ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না ! তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হোল নাকি ? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হোল, নাঃ, সব ভুল ! পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো ? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা খাসা আছি।

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তি মশায় মাইনেটাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনো করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।

আমার ডাক্তারি

আমাকে দত্তমশাই ডেকে বল্লেন—ও ডাক্তারবাবু, জল খেয়ে নিন একটু—

আমি বল্লাম—এখন থাক্, এর পরে হবে।

—না না, সে কি হয় ? আসুন, সামান্য কিছু।

আমার এ সম্বন্ধে একটু বাধ-বাধ ঠেকে। রোজ রোজ আমাকে বাইরের ঘর থেকে ডেকে

এনে জলখাবার খাওয়ানো চাই-ই। আমি ডাক্তারি করি পাড়াগাঁয়ে—নলিনী দত্তমশাইয়ের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে থাকি। আমার কাছে ভাড়া তিনি নেন না। বলেন—না না, ব্রাহ্মণ দেবতা। আপনি আমার বাড়িতে দয়া করে বাস করচেন, এতেই আমার ভিটে পবিত্র হয়ে যাচ্চে। আবার ভাড়া নেবো এই পাড়াগাঁয়ে আপনার কাছে?

সে যাক্ গে। ভাড়া না হয় না নিলেন। কিন্তু রোজ সকালবেলা ডেকে আমায় জলখাবার খাওয়ানো চাই। মুড়ি, গুড়, চিঁড়ে, নারকোল—যেদিন যা জোটে, একটা পাথরের খোরা ভর্ত্তি করে দেবেন। অত খাওয়া আমার অভ্যেস নেই বল্লেও শুনবেন না। আমার লজ্জা করে রোজ রোজ খেতে। ভাড়া নেবেন না, তার ওপর রোজ জলখাবার! এও একরকম জুলুম ছাড়া আর কি?

দত্তমশায়ের মেয়ে এসে বল্লে—ডাক্তারবাবু, আপনি না খেলে বাবা কি কিছু খাবেন? দাঁতে কুটো দেবেন না।

—কেন?

—ব্রাহ্মণ বাড়িতে অভুক্ত থাকলে বাবা খাবেন না।

—বটে! আচ্ছা চলো।

সেদিন গিয়ে দেখি চালভাজা, ছোলাভাজা আর ঝুনো নারকোল কোরা। পৃথক্ বাটিতে খেজুর গুড়। চায়ের ব্যবস্থা এদের বাড়িতে নেই, সেকেলে গৃহস্থ, চা খাওয়ার রেওয়াজ গোড়া থেকেই গড়ে ওঠেনি।

আমি পাস করা ডাক্তার নই। বাড়িতে বই দেখে হোমিওপ্যাথিক শিখে আগে গ্রামেই ডাক্তারি করতাম। কিন্তু গ্রামের লোক পয়সা দিতে চায় না। ধার বাকি ফেলে আর শোধ করে না। তাই দেখেশুনে এই রঘুনাথপুরে এসে বসেচি আজ প্রায় তিন-চার মাস। আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে—আট-ন' ক্রোশ। রেল নেই, হাঁটা পথে আসতে হয়। এ গ্রামে এসে প্রথমে এক চাষী-কৈবর্ত্ত গৃহস্থবাড়িতে দিন পনরো ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে নলিনী দত্তমশায় গিয়ে আমায় বল্লেন—প্রাতঃপ্রণাম হই ডাক্তারবাবু। আপনার নিবাস কোথায়?

—আসুন, বসুন। আপনার এ গ্রামে বাড়ি?

আমার বাড়ির মালিক আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লে—উনি এ গাঁয়ের একজন কর্ত্তা-ব্যক্তি লোক। ওঁর নাম নলিনী দত্ত।

দত্তমশায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না, না, কর্ত্তা না হাতী! ও সব কিছু না। তা গিয়ে, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা অনুরোধ করতে।

—কি, বলুন?

—আমার বাড়িতে দয়া করে আপনাকে থাকতে হবে। আমার বাইরের ঘর আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।

—ভাড়া কি রকম দিতে হবে?

—আপনার নিজের বাড়ি। ভাড়া দেবেন কাকে? চলুন দিকি জিনিসপত্তর নিয়ে।

ভারি অদ্ভুত লোক তো! কিছুতেই ছাড়লেন না। লোক পাঠিয়ে জিনিসপত্তর নিয়ে গেলেন মুকুন্দদের বাড়ি থেকে। গত মাঘ মাসের কথা। সেই পর্য্যন্ত এখানেই আছি।

আজ নলিনী দত্ত বাইরে এসে বল্লেন—এখন কোথাও যাবেন?

—না।

—রুগী কি রকম হচ্চে ?

—মন্দ না।

—রোজ কি রকম হয় ?

—তার কিছু ঠিক নেই।

—দৈনিক দুটো করে টাকা তো হওয়া চাই-ই।

—তা এখনো হয়নি।

—ইয়ে, রাঁধবেন আজ একটু দেরিতে।

আমি তখনই বুঝেচি, কোনো একটা কিছু দিতে চাইচেন। রোজ রোজ নেওয়াটা ঠিক নয়। চক্ষুলজ্জায় বাধে না ? কি একটা ওজর করব ভাবচি, এমন সময় দত্তমশায় বল্লেন—একটা বড় মাছ আজ নেদের বাগান পুকুর থেকে ধরতে বলেচি। রসিক সর্দ্দার বলে আমার এক বাল্যবন্ধু, সে-ই নিয়ে আসবে। আপনাকে মাছ একটু দেবো।

—ও, আচ্ছা বেশ।

আর কি বলি। রোজই এই রকম চলচে।

দুপুরের পর হঠাৎ চারজন লোক এসে হাজির। হাতে পোটলা, কাঁধে ছাতি। দত্তমশায়ের কাছে খবর গেল। তিনি খেয়ে একটু শুয়েছিলেন। শুনে বাইরে এলেন। ওঁদের দেখে আনন্দে বিগলিত ও কৃতার্থপ্রায় হয়ে বিনীত স্বরে হাতজোড় করে বল্লেন—আসুন আসুন। পরম সৌভাগ্য। ওরে ও দীপু, গা-পা ধোবার জল দিয়ে যা—

দীপু দত্তমশায়ের বিধবা মেয়ে। বাড়িতে অন্য মেয়েমানুষ নেই। হাত-মুখ ধোওয়ার জল সে-ই নিয়ে এল। দত্তমশায় বল্লেন—তা হোলে আপনাদের আহারের যোগাড় করি ?

ওঁদের মধ্যে একজন বল্লেন—হাঁ, তা হোক।

আবার বেচারী দীপুকে অসময়ে আগত এই চারজন জোয়ান অতিথির জন্যে রান্না করতে হয়। তাই কি ভাতে-ভাত রান্না ? তা হবার জো নেই। দত্তমশায় বসে তদারক করবেন, অতিথিদের পান থেকে চুন না খসে। এরা নেয়ে এসে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইল। দত্তমশায় ধোপদস্ত চারখানা ধুতি বের করে দিলে তবে পরলে। তারপর জলযোগ সেরে ওরা বসে যখন তামাক খাচ্চে তখন কৌতূহল আর না চাপতে পেরে জিগ্যেস করলাম—আমাদের নিবাস ?

দুজনে বল্লে, হাটগাছা। অন্য দুজনের বাড়ি অন্য এক গাঁয়ে। বল্লাম—দত্তমশায় বুঝি আত্মীয় ?

একজন বল্লেন—না, আত্মীয় নন।

পরে শুনলাম ওঁরা এখানে আসেন খাজনা আদায় করতে।

বছরে একবার বা দুবার আসেন এবং এখানেই ওঠেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এঁদের নিজের নিজের বিষয়সম্পত্তি আছে। প্রতিবার এসে দশ-বারো দিন থাকেন। খাজনা হঠাৎ তো আদায় হয় না, একজন প্রজার কাছে একবারের জায়গায় দশবার ছুটতে হয়, তবে তারা পয়সা বের করে।

এবারও রইলেন প্রায় দশ দিন। যতক্ষণ একটি প্রজার কাছেও খাজনা বাকি থাকবে, ততদিন এঁরা নড়লেন না। আর অসীম ধৈর্য্য আর আতিথেয়তা দেখলাম দত্তমশায়ের। এক-একবার মনে হোত পায়ের ধুলো নিই দত্তমশায়ের।

সকাল থেকে ছুটোছুটি করচেন কোথা থেকে গলদা চিংড়ি মাছ আনা যায়, ভালো কই মাছ কি করে সংগ্রহ করা যায়, অমুকের বাড়ি থেকে পটল আনচেন, অমুকের বাড়ি থেকে মানকচু

আনচেন। সর্ব্বদা চেষ্টা অতিথিদের কি করে খুশী করবেন, কি করে ভালো খাওয়াবেন। এরাও জানে দত্তমশায়ের হোটেলে যতদিন ইচ্ছে থাকো, কেউ বারণ করবার নেই।

আমার কষ্ট হোত দীপু বেচারীর জন্যে।

হোটেলের রাঁধুনী তো আর দ্বিতীয় নেই।

দুবেলা রান্না, তাও কি সোজা রান্না, হরেক রকমের রান্না, গরমজল, কাপড়ে সাবান দেওয়া, সর্দ্দিকাশির পাঁচন জ্বাল দেওয়া—সব ঐ বেচারীর ঘাড়ে।

—ওরে দীপু, সরকার মশায়ের বড্ড সর্দ্দি হয়েচে, একটু পাঁচন করে দিস্ তো।

দীপু অমনি বেরুলো গুলঞ্চের লতা আর বাসক ছাল যোগাড় করতে।

একদিন দেখি বক্‌চেন মেয়েকে।

—তোর একটু হুঁশ করে চলা উচিত। কাল বিশ্বেস মশায়কে মশারি টাঙিয়ে দিলি—তা দেখলিনে কোথায় ছেঁড়া, তিনি সারারাত ঘুমুতে পারেননি মশার উপদ্রবে। কেন, দেখে তখনই একটু সেলাই করে দিলেই মিটে যায়। তোর হুঁশ বড় কম—

মনে মনে ভাবলাম, ওর হুঁশ যদি কম হোত তবে আপনার এ অবারিত-দ্বার হোটেল কোন্‌কালে দরজা বন্ধ করে লালবাতি জ্বালতো। কি রত্ন পেয়েছেন ঘরে, তা ভালো করে চোখ চেয়ে দেখুন।

একদিন দেখি, বাড়ির সামনের জঙ্গলের মধ্যে দীপু কি করচে। বেলা পড়ে গিয়েচে, সন্দে হয়-হয়, বল্লাম—কি ওখানে দীপু?

—কচুর ডাঁটা কাটবো।

—এখন কেন?

—ওনারা কাল কচুর শাক খাবেন বাবা বল্লেন। তাই এখন তুলে ধুয়ে রাত্রে কুটে রেখে দি। সকালে সময় পাবো না।

—এখন অবেলায় ওখানে না যাওয়াই ভালো। সাপ বেরুতে পারে।

—এখন না তুল্লে তুলবো কখন? কাল সময় পাবো না। আজ সারাদিনের মধ্যে এখন একটু যা সময় পেলাম।

—দত্তমশায় কোথায়?

—তিনি ইলিশ মাছ আনতে গিয়েচেন পাঁচঘরার হাটে। কাল কচুর শাক দিয়ে রান্না হবে কিনা।

—আজ ইলিশ মাছ এনে কাল রান্না হবে?

—কেন হবে না? আজ বেশ করে ভেজে রাখবো রাতে। কাল মাছ পাবেন কোথায় হাট ছাড়া? কাল না খাওয়ালে ওঁদের কচুর শাক খাওয়ানো হবে না। পরশু চলে যাবেন সব।

—যাবেন সত্যি? আমার মনে হচ্চে না।

দীপু আমার কথার শ্লেষ বুঝতে না পেরে বল্লে—কেন মনে হচ্চে না?

মেয়েও তো দত্তমশায়েরই। বাপের মতই সরল। বল্লাম—না, তাই বলচি।

—বাবা বলছিলেন কালকের দিনটা ওঁরা আছেন, পরশু চলে যাবেন। কাল রাতে তালের বড়া করে খাওয়াতে।

—বেশ বেশ। খাওয়াও। অতিথিসেবায় পরম পুণ্য।

—কত রকমের রান্না হচ্চে বাড়িতে। কিন্তু আপনাকে দিতে পারিনে বলে কষ্ট হয়।

—দিতে বাধা দিচ্চে কে? আমি বাধা দিইনি অন্তত।

—কি যে বলেন ! ব্রাহ্মণের পাতে রান্না তরকারি দেবো সে ভাগ্যি কি আর করে এসিচি ?

—তা হোলে মিটেই গেল।

—একটা জিনিস কাল খাওয়াবো।

—কি ?

—বলুন না ?

দীপুর চোখে কৌতুকের হাসি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কি জিনিসের কথা বলচে। তবুও মজা দেখবার জন্যে বল্লাম—তুমি বলো। আমি বুঝতে পারলাম না। কচুর শাক ?

দীপু হি-হি করে হেসে বল্লে—না। আহা, কি বুদ্ধি আপনার ! কচুর শাক তো সকড়ি। আমার রান্না কচুর শাক আপনার পাতে দেবো ?

আমি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লাম—সে আমার অদৃষ্ট !

—আহা ! আপনার অদৃষ্ট না আমাদের অদৃষ্ট ! আপনি ভারি—

—কি জিনিসটা কাল খাওয়াবে বল্লে না ?

—তালের বড়া।

—ওটা বুঝি সকড়ি নয় ? তবুও মাথা রক্ষে। বাঁচলুম।

—থাক্, আপনাকে আর ব্যাখ্যান করতে হবে না। চলি এখন, অনেক কাজ।

দীপুকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ওর বয়েস হবে, কিন্তু বালিকার মত সরল। মুখ বুজে কি খাটুনিটাই খাটে দিনরাত ! বাবার মন যুগিয়ে চলতে ওর জোড়া নেই, দত্তমশায় মুখের কথা খসালেই হোল। ও কি খায় সারাদিন খাটুনির পর তা কে দেখচে ? দত্ত-মশায় নিজের অতিথিদের নিয়েই ব্যস্ত। তাদের বেলা পান থেকে চুন না খসে।

পরের দিন শুনলাম অতিথিরা আরো দিন চার-পাঁচ থেকে যাবেন। খবরটা পেলাম দত্ত মশায়ের মেয়ের কাছ থেকেই। সে এসে বল্লে—আমার পাপ হবে, না ডাক্তারবাবু ?

অবাক্ হয়ে বল্লাম—পাপ ? কিসের পাপ ?

—আপনার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না, সেইজন্যে ?

—কি কথা ?

দীপু কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমি ওর কথা শুনি মন দিয়ে। সায় দিই ওর কথায়, বোধ হয় ওর ভালো লাগে। কথা বলবার মানুষ এ বাড়িতে আর ওর কেউ নেই আমি ছাড়া।

ও বল্লে—ভুলো কেন ও-রকম আপনি ? তালের বড়া খাওয়াতে চেয়েছিলাম আজ মনে আছে ? তা আজ হোল না।

—তা হোলে অতিথিদের তালের বড়া খাওয়ানো হোল না ?

—সেই জন্যেই তো। ওঁরা কাল যাবেন না। আরো দিন চার-পাঁচ থাকবেন কিনা, তাই বাবা বললেন আজ না করে ওঁদের যাবার আগের দিন করলেই হবে।

—খুব ভালো কথা। কিন্তু—ওঁদের তো কালই যাবার দিন ধার্য্য ছিল ?

—কি নাকি বাঁশঝাড় নিয়ে গোলমাল বেধেচে ওঁদের মধ্যে একজনের। সে গোলমাল না মিটিয়ে তো যাওয়া হয় না।

—সে তো বটেই। একজনের কাজ যখন বাকি, তখন বাকি তিনজন একযাত্রায় পৃথক্ ফল করে আর যান কি ভাবে ? যাওয়া উচিত নয়।

—সে আবার কি ?

—ওই একটা কথার কথা ধরো।

—ভারি মজার কথা বলেন আপনি কিন্তু। হাসি পায় এমন!

—সে যাক্, তাহোলে তালের বড়া হচ্ছে কবে?

—সেই যেদিন যাবেন, তার আগের দিন। তবে শুনুন একটা কথা বলি। আপনার জন্যে ছোট্ট একটা তাল এনে রেখেচি। সেইটেই গোলা করে অল্প চাট্টি বড়া আপনাকে ভেজে দেবো এখন সন্দেবেলা।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম—না না দীপু। লক্ষ্মী, আমার কথা শোনো। আমার জন্যে আলাদা করে তোমায় কিছু করতে হবে না। কেন করতে যাবে তা? আমি ওতে রাগ করবো। না, করবে না।

দীপু না দাঁড়িয়ে চলে গেল। ও কখন আসে, কখন যায়, বোঝা যায় না। নাঃ, এর সঙ্গে পারা যাবে না। আমার কোনো দরকার নেই তালের বড়ায়। ও কি শুনবে কোনো কথা? যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে।

অতিথিদের ওপর ভারি রাগ হোল আমার।

এসেচ নিজেদের খাজনা আদায় করতে, বিষয়-আশয় দেখতে, তা পরের ঘাড়ে কেন রে বাপু? মানুষের একটা চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত। বাবা আর মেয়েকে সরল আর ভালোমানুষ পেয়ে—হোত অন্য জায়গা, এতদিন সেখানে বসে আজ পায়েস, কাল রুইমাছ খেতে কেমন দেখতাম।

অতিথিদের একজনের নাম জনার্দ্দন সরকার, ধূর্ত্ত দৃষ্টি চোখে, কূট বিষয়ী আর মামলাবাজ, দেখলেই বোঝা যায়। আমায় বিকেলের দিকে ডেকে বল্লে—ও ডাক্তারবাবু, বলি কি হচ্চে?

নীরস স্বরে বল্লাম—কিছুই না। বসে আছি।

—এখানে রুগীপত্তর কেমন?

—মন্দ না।

—কতদিন আছেন এখানে?

ভালো বিপদ! আমার গল্প করবার ইচ্ছে নেই ওর সঙ্গে!

আছি না আছি, সে খোঁজে কি দরকার তোমার? তোমার গলা জড়িয়ে ধরে সে সব বর্ণনা করবার ইচ্ছেও আমার নেই। বল্লাম—কেন বলুন তো?

—না, সেবার এসে আপনাকে দেখিনি কিনা তাই।

—আপনারা কি-বছর আসেন বুঝি এখানে?

—তা আমরা আসচি আজ দশ-এগারো বছর। নরসিংহপুরে আমার তালুক আছে। এই সময় খাজনা আদায় করতে আসি। আমরা ক'জনই আসি। সকলেরই বিষয় আছে পাশা-পাশি মৌজায়। এসে দত্তমশায়ের বাড়ি উঠি। উনি স্বজাতি আর বড় ভালো লোক। আর কোথায় যাই বলুন।

—তা তো বটেই। কোথায় আর যাবেন। আজকাল কেউ কাউকে জায়গা দেয় না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। আমি ঘরের দাওয়ায় বসে ভাবচি এইবার রান্নার আয়োজন করা যাক। এমন সময় দীপু হাসিমুখে দাওয়ায় উঠে একটা পাথরের বাটি আমার সামনে রেখে বল্লে—এই নিন। আলো জ্বালেননি?

বল্লাম—না, এই ভাত রান্না করবো ভাবচি এখুনি। এবার জ্বালাবো। এতে কি?

বলে বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি তালের বড়া। সদ্য ভাজা, গরম। আমি কিছু বলবার আগেই ও বল্লে—ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছিলাম খাওয়াবো। তাই ছোট্ট একটা তালের গোলা করে আপনার জন্যে গোটাকতক ভেজে এনেচি। গণ্ডা দশ-বারো সবসুদ্ধু। আমি যাই, রান্না-বান্না সব পড়ে রয়েচে।

—শোনো দীপু, যেও না, আমার আলোটা জেলে দিয়ে যাও।

—অত কুঁড়ে কেন? কই কোথায় দেশলাই দেখি?

—আচ্ছা, কেন তুমি আমার জন্যে তালের বড়া করতে গেলে? আর কারো জন্যে না?

—না, না, শুধু আপনার জন্যে। বাবার কাছে বলবেন না। কেউ জানেন না। সব লুকিয়ে ফেলেচি। তালের খোসা, তালের গোলা—চললাম। কেউ যেন জানে না।

দীপু চলে গেল। ওর তালের বড়ার বাটি আমার সামনে পড়ে রইল। জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কোথায় কি নৈশ পুষ্প ফুটেচে তার সুবাস বেরুচ্চে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

দীপুর মনের ভেতরটা আমি এই নির্জ্জন আঁধার সন্ধ্যায় বসে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওর মুখের হাসিতে তা ধরা দিয়েচে। ওর মন আমি বুঝতে পেরেছি—ও নিজে হয়তো বোঝেইনি।

এখানে আমি আর থাকবো না। থাকা উচিত হবে না। অতিথির দলকে দত্তমশায় তোয়াজ করুন যত খুশি, তারা তালুকমৌজার বৈষয়িক সুবন্দোবস্ত যতদিন ধরে করুক বসে, কিন্তু আমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। দত্তমশায় অতি সরল, ভালো লোক। দীপুও তাই। ওদের নামে কোনো কথা উঠলে আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। তা ছাড়া, জালে জড়াই কেন নিজেকে? আমার বাড়িতেও স্ত্রীপুত্র আছে।

সেই সপ্তাহের শেষেই নির্ম্মম ভাবে জাল গোটালাম।

দত্তমশায় এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। বল্লেন—বলা কওয়া না, হঠাৎ চললেন, মানে? কি অপরাধ হোল আমার?

কোনো লম্বা কৈফিয়ৎ দেবার আবশ্যক বিবেচনা করিনি। ডাক্তারি ভালো চলচে না, রুগী-পত্তর সুবিধে হচ্চে না। দীপু যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা এলো। বল্লে—আপনি নাকি চলে যাচ্চেন, সত্যি?

—হ্যাঁ।

—কেন যাবেন?

—চলচে না।

—কেন, বেশ তো রুগী আসে?

—ওতে ডাক্তারি চলে না।

—যাবেন সত্যি?

—হুঁ।

দীপু কেঁদে ফেললে। চোখের জলে ভিজে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমি চলে যাবার সময় দত্তমশায়ের ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।

সাত মাস পরে দত্তমশায়ের এক চিঠি পেলাম। দীপুর খুব অসুখ। আমি যেন একবার দেখতে যাই। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামেই ডাক্তারখানা খুলে বসেচি। দু'একদিন যেতে দেরি হোল। গিয়ে দেখি দীপু বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েচে। আগেকার স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী দীপুকে

আর চেনা যায় না। আমায় দেখে দীপুর রোগশীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার পাশে ওর হাত দুটি ধরে বল্লাম—কি হয়েচে দীপু? দেখি হাত?

ও বল্লে—কিছু হয়নি।

—তবে এমন চেহারা হয়েচে কি করে? দাঁড়াও দেখি।

দত্তমশায় বোধ হয় অতিথির জন্যে চা ও খাবারের যোগাড় করতে বাইরে গেলেন। আমি ওর হাত দেখলাম। জ্বর রয়েচে নাড়িতে। পুরনো ম্যালেরিয়া জ্বর, ভালো চিকিৎসা হয়নি। সংসারের খাটুনি এক দিনের জন্যে কামাই যায়নি। অতিথি তো লেগেই আছে। অনুমানে বুঝলাম সব। শরীর ওর একেবারে ভেঙে গিয়েচে?

দীপু আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কি রকম দেখলেন?

—ভালো। সেরে যাবে। গোটাকতক ইন্‌জেক্‌শন নিয়মিত দিলেই হবে। শক্ত অসুখ কিছু না।

—একটা কথা বলবো?

—কি?

—আপনি এসে আমাদের বাড়ি আবার থাকুন না কেন?

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। দাঁড়াও একটা ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে এখুনি।

—দেবেন এখন। আপনি আসবেন বলুন! সত্যি, বলুন!

দীপুকে বাঁচাতে পারিনি। শেষ পর্যান্ত রাণাঘাট মিশন হাসপাতালে আমি ও দত্তমশায় নিয়ে গেলাম ওকে। শেষ দিন আমার হাত ধরে বলেছিল—আমি সেরে উঠলে আমাদের বাড়ি এসে থাকবেন, সত্যি? অনেক রুগী হবে এবার—

চূর্ণী নদীর ধারে ওর সৎকার করার পরে আমরা দুজনে ফিরে এলাম দেশে। দত্তমশায় আমার হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—একলা থাকতে পারবো না ডাক্তারবাবু। আমার বাড়ি এসে আপনাকে থাকতে হবে। আমার আর কেউ নেই।

দীপুকে কথা দিয়েছিলাম হাসপাতালে। দত্তমশায়ের বাড়ি এসে আবার ডাক্তারখানা খুলেচি। দীপুর মুখের কথা সত্যি হয়েচে বটে, আজকাল রুগীর ভিড় খুব।

বর্শেলের বিড়ম্বনা

'বর্শেল' অর্থাৎ বঁড়শি ও ছিপ দিয়ে মাছ মারতে যে পটু। এক কথায় ওস্তাদ মৎস্যশিকারী। লাঠি যে চালাতে পটু সে হোল 'লেঠেল', ছিপ-বঁড়শি বাইতে যে পটু সে হোল 'বর্শেল'।

এই সামান্য ভূমিকার দরকার ছিল এই জন্যে যে অনেকেরই 'বর্শেল' কথাটির অর্থ জানা নেই হয়তো—প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা প্রয়োজন যে, যেমন লাঠি হাতে নিয়ে সবাই বেড়ায়, কিন্তু সবাই লেঠেল নয়, তেমনি ছিপ দিয়ে মাছ সবাই ধরে, কিন্তু তারা বর্শেল নয়।

আমাদের গাঁয়ের রামহরি ছোড় নামজাদা বর্শেল, আশপাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে তাঁর নাম বর্শেল হিসাবে প্রসিদ্ধ। 'তাঁর' ব্যবহার করলাম এজন্যে যে, রামহরি বনেদী ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান আমাদের গাঁয়ের—লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, বড় বড় গোঁফ, চোখ বড় বড় ও রাঙা। আমরা ছেলেপুলের দল তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে চলি, বড্ড রাশভারী লোক। আগে অবস্থা খুব ভাল ছিল, এখন বিষয়-সম্পত্তির সামান্যই অবশিষ্ট আছে; তারই আয়ে অতি কষ্টে সংসার চলে।

রামহরি জীবনে কারো চাকুরি করেননি, এখন তিনি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেচেন—সুতরাং এ বয়সে পরের দাসত্ব আর স্বীকার করবেন না এটা নিশ্চয়।

কিন্তু মাছ ধরা সম্বন্ধে একজন 'অথরিটি' তিনি। বহু লোক এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে আসে।

—হ্যাঁ হোড়মশাই, গাঙে কি চার করে রাখবো আজ ?

—কিসের চার দিচ্ছ ?

—গোবর আর কেঁচো।

—নতুন বর্ষার জল, তুঁষ আর কুঁড়ো দাও।

তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিস্তৃত। কে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করবে ? হোড় মশায় জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ধরনের বড় মাছ ধরেচেন, তাঁর মুখে সে-সব গল্প শুনলে আহার-নিদ্রা ভুলে যেতে হয়। অবিশ্যি আমাদের মত ছেলেমানুষের সঙ্গে সে-সব গল্প তিনি কখনো করতেন না, বড় লোকেদের সঙ্গে বসে বলতেন, আমরা বসে শুনতাম।

এ সব পঁচিশ বছর আগেকার কথা বলচি, আগেই বলে রাখি।

আমার তখন বারো-তেরো বছর বয়েস। আষাঢ় মাস, খুব বর্ষা হয়ে গিয়েচে, মাঠে-ডোবায় জল থৈ-থৈ করচে।

হাবুল বল্লে, মাছ ধরতে যাবি সন্তুদা ? জটেমারির খালে বড় বড় বান মাছ আর জিওল মাছ পড়চে।

—কে বল্লে ?

—কাল গোপাল আর নেড়াকাকা এই বড় বড় বান মাছ ধরে এনেচে।

—তোর বড় ছিপ আছে ? আমায় একখানা দিবি ?

—দুখানা মোটে আছে—বাকি তিনখানা পুঁটিমাছ ধরা ছিপ।

বেলা তিনটের পর আমরা চারজন সমবয়সী বন্ধু জটেমারির খালে কাঠের পুলের নীচে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি—রামহরি হোড় সেখানে তাঁর লম্বা লম্বা ছিপগুলো নিয়ে দস্তুরমত চারকাঠি পুঁতে একমনে গম্ভীর মুখে একা বসে।

সন্তু প্রশংসাসূচক বিস্ময়ের সুরে বল্লে—রামহরি জ্যাঠা মাছ ধরচে !

আমি বল্লাম—কই ?

—ঐ ছাখ্ ঐ গাছের নীচে।

আমার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো। মস্ত-বড় বর্শেল রামহরি জ্যাঠা দস্তুরমত চারকাঠি পুঁতে মাছ ধরতে বসেচেন। যদি মাছ ধরতে হয়, তবে ওঁর আশেপাশে বসে। নয়তো মাছ হবে না। যে যে-সাধনায় সিদ্ধ তার শরণাপন্ন না হোলে সে-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

আমি বল্লাম—চল্, রামহরি জ্যাঠার ডাইনে ওই ফাঁকা জায়গাটায় ছিপ ফেলি।

হাবুল বল্লে—উনি যদি বকেন ?

—বকেন তো বকবেন, দেখছিস্ নে, ওঁর চারে বড় বড় মাছ সব আসতে শুরু করেচে ! অমন ওস্তাদ এ দেশে নেই। কি দিয়ে চার করতে হয়, কিসে বড় মাছ আসে, এ উনি যেমন জানেন, এমন কেউ জানে না।

আমরা পাশে বসবার উদ্যোগ করচি, রামহরি বর্শেল কিন্তু সেটা তত প্রীতির চক্ষে দেখলেন না। একটা কারণ হচ্চে, তিনি মাছ জড়ো করবার মশলা ছড়িয়েচেন জলে, এখন অন্য কেউ এসে তাঁর তৈরি জমিতে চাষ করুক, এটা তিনি পছন্দ করলেন না। দ্বিতীয়তঃ আমরা চঞ্চল

বালক, তাঁর মত চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না, গোলমাল করবোই। তা হোলে মাছ আসবে না চারে। ভয় পেয়ে ভেসে যাবে।

রামহরি হোড় তুরীয় অবস্থা থেকে নেমে এসে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন—এই! ওখানে বসবি নাকি?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। আপনার পায়ে পড়ি কিছু বলবেন না আমাদের।

রামহরি বিরক্তিপূর্ণ মুখে বল্লেন—যতো আপোদ! আর জায়গা পেলি নে? আচ্ছা চুপ করে বোস্। কেউ কথাটি কইবি নে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ছিপ ফেলেচি আমরা, কিন্তু একটা মাছও ঠোকরায় নি। গোলমাল না করি, কথাবার্ত্তা চলচে সমানে। ক্রমে কথাবার্ত্তার স্বর চড়লো।

পচা বল্লে—ওই ক্ষেতটাতে কাঁকুড় হয়েচে, সন্তু যা গোটা-চারেক কচি দেখে কাঁকুড় তুলে আন—

রামহরি বর্শেল ওদিক থেকে ধমক দিয়ে বল্লেন—এই সব, কি হচ্চে?

আমরা ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে হাবুল এবং পচা বাবলা-কাঁটার নীচু বেড়া ডিঙিয়ে অদূরবর্ত্তী কাঁকুড়ের ক্ষেতে ঢুকে পড়লো এবং তিনটে বড় বড় কাঁকুড় নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল।

গণ্ডগোল বাধলো কাঁকুড়ের ভাগ নিয়ে।

আমি বল্লাম—তোমরা ভাগ বেশী নেবে কেন? সমান ভাগ করো। আমি তোমাদের ছিপ নিয়ে চৌকি না দিলে তোমরা কাঁকুড় আনতে পারতে?

পচা বল্লে—আমি বড়টা তুলেচি, ওটা আমার।

যতীশ নাপিতের ছেলে কেষ্ট বল্লে—তা কেন? সমান ভাগ হবে।

রামহরি আবার ধমক দিয়ে বল্লেন—ও সব কি হচ্চে রে? মাছ ধরতে এসেছিস্, না কাঁকুড় খেতে এসেছিস্ এখানে?

আমি বল্লাম—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না জ্যাঠামশায়!

—কি করে মাছ ঠোকরাবে? তোমাদের তো মাছ ধরা নয়, মাছ ধরা খেলা। কি জানিস্ তোরা মাছ ধরার? সব ক'টাতে জুটে হুটোপাটি করচিস্ আর কাঁকুড় চুরি করচিস্ পরের ক্ষেত থেকে। মাঝে পড়ে আমারও মাছ হোল না তোদের গোলমালে। নইলে যা চার করেছিলাম, কুঁড়ো দিয়ে আর পুরনো তেঁতুল—

রামহরি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। উত্তেজনার মুখে মৎস্য-শিকারের গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করে ফেলেছিলেন আর একটু হোলে।

আমি চুপি চুপি বল্লাম—ওই শুনে রাখ, কুঁড়ো আর পুরোনো তেঁতুল—এই দিয়ে চার করতে হবে বুঝলি তো! ভুলে বলে ফেলে দিয়েচেন—

হাবুল ছিপ একখানা জল থেকে তুলে বল্লে—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না।

রামহরি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছিপটার দিকে চেয়ে বল্লেন—ও কি বহর দিয়েছিস্? তোদের সবই হোল ছেলেখেলা! জল মেপে বহর দিতে হয়।

আমি আগ্রহের সুরে বল্লাম—সে কি করে করতে হয় জ্যাঠামশায়?

—জল মেপে নিস্‌নি?

—তা তো জানিনে।

রামহরি দাঁত খিঁচিয়ে বল্লেন—তা জানবে কেন? জানো কাঁকুড় চুরি করতে। ঢিল বেঁধে

সুতো জলে ছেড়ে দ্যাখো কতটা ভিজেছে—সেখানে ফাতনা তুলে বাঁধো—তাকে বহর দেওয়া বলে। দেখি?

আমি ছিপ তুলে দেখাতে রামহরি বর্শেল সেদিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—আড়াই হাত বহর দে।

সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। রামহরি বর্শেল স্বয়ং আমাদের বহর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েচেন। এইবার মাছ না হয়ে যায়?

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পরে আমাদের মধ্যে আবার গুঞ্জন-রব উত্থিত হোল এবং খুব শীগ্‌গির সে গুঞ্জন কলরবে পরিণত হয়ে গেল। এবার গোলমাল বাধলো ছিপের বহর নিয়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ ধরতে ব্যগ্র।

পচা বল্লে—আমায় ছিপ দাও—আমি নিজে বহর দিই।

আমি বল্লাম—তুই কি বুঝিস বহরের? আমায় দে, দিয়ে দিচ্চি।

—থাক্, তোর আর ওস্তাদি করতে হবে না—ঢের হয়েচে।

—মুখ সাম্‌লে কথা কবি সন্তু!

—তুই মুখ সাম্‌লে—

আমাদের সুর তখন পঞ্চমে উঠেচে। রামহরি বল্লেন—কি বিপদেই পড়েচি এদের নিয়ে! আজ যে আমার চার করাই মাটি হোল দেখচি এদের জ্বালায়! তোরা বাপু অন্য জায়গায় যা—ওঠ ওখান থেকে—বেরো—

আমরা তাড়া খেয়ে ছিপ গুটিয়ে সেখান থেকে উঠে আর কিছু দূরে গিয়ে বসলাম। একটা কাশঝোপের আড়াল থাকার দরুন সেখান থেকে রামহরি বর্শেলকে ভাল করে দেখা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সামনের ছোট খালে কচুরিপানার দামে নীল ফুল ফুটেছে, বর্ষার জল থৈ-থৈ করচে খালের কানায় কানায়। ওপারের চরে আরামডাঙা গ্রামের বাঁশ-খেজুর-তালগাছের শীর্ষ বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের তলায় একটি শ্যামল সরলরেখা রচনা করেচে। দু-একটা সাদা বক জলের ধারে পানা-শেওলার দামের ওপর চরে বেড়াচ্চে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনে আমরা রামহরি জ্যাঠার দিকে চাইলাম। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একটা বড় ছিপ দু-হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে তুললেন—এটুকু আমরা দেখলাম। তারপর তিনি বলে উঠলেন—যাঃ—

হাবুল বল্লে—রামহরি জ্যাঠা মস্ত বড় মাছ বাধিয়েচে, চল্ গিয়ে দেখি—

সবাই মিলে তখনি ছুটে গিয়ে শুনলাম প্রকাণ্ড মাছ বেধেছিল ওঁর ছিপে, কিন্তু উনি টান দিতেই ছিপের আগা ভেঙে নিয়ে মাছটা পালিয়েচে। সত্যি দেখি, বড় একটা ছিপের আগার দিকটা ভাঙা, ছিপটা হাতে করে বোকার মত রামহরি দাঁড়িয়ে।

আমাদের দেখে বিরক্তির সুরে ঝাঁজের সঙ্গে তিনি বল্লেন—তোদের জন্যে আজ সব মাটি। না দিলি চারে মাছ আসতে, না দিলি সুস্থ হয়ে মাছ ধরতে। সেই বেলা তিনটে থেকে পেছনে লেগেচিস্ বাপু, মাছ ধরতে আসিস্ কেন তোরা? কি বুঝিস্ মাছ ধরার? এ কি ছেলের হাতে পিঠে? এত বড় মাছ খেলে, তোদের জ্বালায় তুলতে পারলাম না, সুতো কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল। নাঃ, আজ আর মাছই ধরবো না। কাল থেকে আমার ত্রিসীমানায় বসতে দেবো না বলে দিচ্চি—

রামহরি জ্যাঠার যত রাগ আমাদের ওপর এসে পড়েচে বুঝলাম। নইলে তাঁর মাছ পালিয়ে

গেল সুতো কেটে, তাতে আমাদের অপরাধ কোথায় ? হাবুল নীচু সুরে বল্লে—বা রে, উনি পচা সুতো নিয়ে মাছ ধরতে এসেচেন, তাতে আমাদের দোষ বুঝি ? আমরা মাছকে শিখিয়ে দিইনি তো—

যাহোক্, রামহরি জ্যাঠা তো ছিপ গুটিয়ে চলে গেলেন। তারপরেই যে ঘটনাটি ঘটলো, আমাদের মত বালকের জীবনে সেরূপ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

রামহরি জ্যাঠা চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ আমার নজর গেল বাঁ-দিকের শেওলা-দামের ধারে একটা সাদা শরের ফাত্না একবার ডুবচে একবার উঠচে। আমার কথায় হাবুলও সেদিকে চেয়ে দেখলে। ফাত্নাটা ক্রমেই যেন ডাঙার দিকে আসতে লাগলো—অথচ খালের স্রোত তো এখন উল্টোদিকে বইচে, তবে ফাত্না ডাঙার ধারে আসচে কিসের জোরে ?

হাবুল বল্লে—তাই তো সন্তুদা, ওটা কি হচ্চে ?

হঠাৎ আমি জিনিসটা বুঝতে পারলাম। রামহরি জ্যাঠার সেই ছিপের ফাত্না! বড় মাছ ওর তলায় বঁড়শিতে বেধে আছে।

কথাটা যেমন মনে হওয়া, আমার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন কিসের ঝাঁজ বেরিয়ে গেল! ততক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেচি। হাবুলকে বল্লাম—রামহরি জ্যাঠার সেই মাছটা! ও জখম হয়ে এসেচে বলে অবসন্ন হয়ে ডাঙার দিকে আসচে। জলে নামো সবাই।

হাবুল বল্লে—পচা, তুই ছেলেমানুষ আছিস, পরনের কাপড় খুলে ফেল্, মাছটাকে কাপড় দিয়ে জাপটে ধরতে হবে।

আমি বল্লাম—ভারী মাছ, খুব সাবধানে তুলবার চেষ্টা করো। জলের তলায় ওর কুমীরের মত শক্তি।

সবাই মিলে জলে নামলাম। ফাত্না ধরে সন্তর্পণে টান দিতেই জলের তলায় প্রকাণ্ড মাছ ঝটপট করে উঠে জল ছিটিয়ে আমাদের সারা গা ভিজিয়ে দিলে। আমাকে তো টেনেই নিয়ে গেল কিছুদূর—হাবুল আমার কোমর জড়িয়ে টেনে রাখলে। বল্লে—টান দিস্ নে, সুতো ছিঁড়ে যাবে—মস্ত মাছ—সাবধানে তোল্।

প্রায় মিনিট পনরো ধরে মাছটা যুঝল। যারা কখনো বড় মাছ ছিপে ধরেচে, তারাই জানে এ ব্যাপার কি! এক-একবার এমন হোল যে, মাছ বুঝি আর থাকে না, চোঁ-চোঁ ছুটলো বেশী জলের দিকে। তার চেয়েও ভয় ছিল ঘন কচুরিপানার দামের নীচে গিয়ে লুকুলে এ মাছের আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

অবশেষে মাছটা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। মুখে আড়াই ইঞ্চি বঁড়শি নিয়ে কতক্ষণ পারবে ? মাছ অবসন্ন হোলে ক্রমশঃ আপনিই ডাঙার কাছে আসে। পচা সেই সময় কাপড় দিয়ে মাছটা জাপটে ধরলো—আমরা সবাই গিয়ে পড়লাম মাছটার ওপরে। টেনে ডাঙায় তুলে দেখি, সের-পাঁচেক আন্দাজ ওজনের রুইমাছ।

গ্রামে ঢুকবার পথেই রামহরি বর্শেলের ঘর। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেচে, রামহরি জ্যাঠা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন। আমরা হৈ-হৈ করে আসচি দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন —কি রে ? মাছ পেলি নাকি ?

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাই। রামহরি জ্যাঠার নাকের সামনে দিয়ে বড় মাছটা নিয়ে যাবো!

দাওয়া থেকে নেমে এসে রামহরি বল্লেন, এত বড় মাছটা তোরা কোন্ ছিপে ধরলি ? তোদের সঙ্গে তো বড় ছিপ ছিল না!

আমি বল্লাম—হরকওলা বঁড়শির একখানা ছিপ আছে—এই যে!

রামহরি হাজার হোক, ওস্তাদ বর্শেল তো! আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—মাছটার নিতান্তই তা হোলে মরণ ছিল। হরকওলা বঁড়শিতে পাঁচ সের রুইমাছ ওঠে, এ কখনো সম্ভব হয় না। তোদের ও ছেলেখেলা করতে গিয়ে এত বড় মাছটা জুটে গেল অমনি অমনি—নইলে ও-মাছ হরকওলা ছিপে ডাঙায় ওঠানো তোদের সাধ্যি ছিল? ওই যে বল্লাম, মাছটার কপালে নিতান্তই মৃত্যু ছিল আজ!

বাড়ি ফিরে রামহরি জ্যাঠার বাড়ি আমরা সের দেড়েক কাটা মাছ আর মুড়োটা পাঠিয়ে দিলাম।

কাদা

একঘেয়ে গ্রাম্যজীবনের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল আমাদের পাশের বাড়ির শ্যামাকান্ত চক্কত্তির বিয়ে। শ্যামাকান্ত চক্কত্তি আমার কাকা হন, অবিশ্যি গ্রামসম্পর্কে। শ্যামাকাকার বয়েস কত তা জানিনে, তিনি নাকি কলেজে পড়েন কলকাতায় না কোথায়। গ্রামে আসেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

বিয়ে হচ্চে আমাদের গ্রামের কাছে নসরাপুর।

নসরাপুর গ্রামের বীরেশ্বর ভট্‌চাজের মেয়ে। বীরেশ্বর ভট্‌চাজকে দেখেছি, বুড়োমানুষ, ঐ গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। আমাদের গাঁয়ে এসেছিলেনও বারকয়েক।

বিয়ে হবে সামনের সোমবারে।

হৈ হৈ পড়ে গেল পাড়ার ছেলেদের মধ্যে।

আমাদের দল ঠিক করলে একটা উৎসব করতে হবে এই বিয়ের দিনে। আমার উৎসাহটা সব চেয়ে বেশি। আমি ভেবেচিন্তে দক্ষিণ মাঠের বিলের ধার থেকে কতকগুলো পাকাটি নিয়ে এলাম এবং পথের ধারের প্রত্যেক গাছে এক গাছা করে পাকাটি নোনার ডালের ছোটা দিয়ে বাঁধলাম।

হরি জ্যাঠামশায় দেখে বল্লেন—ও কি হচ্চে?

বড় বড় মোটা কাঁচের পরকলা বসানো চশমার ভেতর দিয়ে দেখি হরি জ্যাঠামশায় আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্চেন। ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লাম।

—বলি—ও—এই—

—কি?

—বাজি আলো করবো শ্যামাকাকার বিয়েতে। তাই পাকাটি বাঁধচি।

—ইঃ! যত ছেলেমানুষি! এই একটা সরু পাকাটি জ্বেলে আলো হবে? কতক্ষণ জ্বলবে ওটা?

—যতক্ষণ হয়।

—ছাই হবে। বুদ্ধি কত! ও কখনো জ্বলে?

হরি জ্যাঠামশায় চলে গেলেন। আমার রাগ হোল মনে মনে। উনি সব জানেন কিনা? পাকাটি জ্বলবে না তো কি জ্বলবে?

ক্রমে বিয়ের দিন এসে পড়লো। যেদিন বিয়ের বর রওনা হয়ে চলে গেল, সেদিন পাকাটি জ্বালতে সঙ্গী সতু ও হীরু বারণ করলে। আজ জ্বেলে কি হবে? যেদিন বর আসবে বৌ নিয়ে,

সেদিন জেলে দিবি। দেখাবে ভালো।" বিয়ের বরযাত্রী গেল গাঁসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে। কিন্তু আমার যে অত উৎসাহ, আমারই যাওয়া হোল না। কেন যে যাওয়া হোল না, কি জানি। বাবা গেলেন অথচ আমায় নিয়ে গেলেন না।

তার জন্যে কোনো কান্নাকাটি করলাম না।

খাওয়ার ওপর আমার বিশেষ কোন লোভ নেই। খেয়ে আমি সহ্য করতে পারিনে, পেটের অসুখ করে। ওই জন্যেই বোধ হয় বাবা আমায় নিয়ে গেলেন না, কে জানে?

মঙ্গলবারে সন্ধ্যের আগে বর-বৌ আসবে, বরযাত্রীরা ফিরে এসে বল্লে।

আমি ঠিক করলাম যেমন ওরা আসবে অমনি যে পথে আসবে ওরা, সে পথের দুধারের গাছে যত পাকাটি বেঁধেছি, সবগুলো জ্বালবো।

কেবল ঘর-বার করছি, একে ওকে কেবল জিগ্যেস করছি, কখন বর আসবে।

বেলা যায়-যায়।

এমন সময় নীলু এসে বল্লে—শীগগির চল—বৌ আসচে—

আমি বল্লাম—কে বল্লে?

নীলু আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো। গোয়ালাপাড়ার মোড়ে গিয়ে বাজনার শব্দ পাওয়া গেল যথেষ্ট। বল্লাম—কদ্দূর রে?

—তা বুনোপাড়ার কাছে হবে। অনেক দূর এখনো।

দেখতে দেখতে শ্যামাকাকার ঘোড়ার গাড়ি কাছে এসে গেল।

আমরা ঘোড়ার গাড়ি বেশি দেখিনি, দু-একখানা কালেভদ্রে শহর থেকে এসে এ গ্রামে ঢোকে, তাও আমাদের জীবনে সবসুদ্ধু মিলে বার-দুই দেখেছি মাত্র।

ছেলের দল কলরব করে উঠলো—ওই রে ঘোড়ার গাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বর-বৌসুদ্ধু গাড়ি কাছে এসে পড়লো।

এইবার কিন্তু বাধলো মুশকিল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে খানিকটা কাঁচা রাস্তায় গেলে আমাদের গ্রাম। শ্রাবণ মাসের শেষ, বেজায় কাদা হয়েচে কাঁচা রাস্তায়। বিশেষ করে একটা জায়গায় হাবড় কাদা—সেটার নাম ষাঁড়াতলার দ'। গাড়ি সেখানে এসে সেই হাবড়ে পড়ে পুঁতে গেল। মোষের গাড়ি সে গাড়ি সে কাদায় পড়লে ওঠে না, শহুরে ঘোড়ার সাধ্যি কি সে হাবড় থেকে গাড়ি ওঠায়?

ননী বল্লে—এ রামকাদা থেকে বাছাধনের আর উঠতে হবে না। ও রোগা ঘ্যানা ঘোড়ার কম্মো এই হাবড় ঠেলে ওঠা?

তখন সবাই মিলে চাকা ঠেলতে লাগলাম। গাড়ি চলে এলো শ্যামাকাকাদের বাড়ি। শ্যামাকাকার মা বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বর্ষাকাল, রোদ আছে কি নেই বোঝা যায় না—যদিও তিন-চারদিন বৃষ্টি হয়নি। আমাদের আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েচে ঘোড়ার গাড়িখানা। সেখানা বকুলতলায় দাঁড়িয়ে, তার চারিপাশ ঘিরে গ্রামের যত ছেলেপিলে। গাড়োয়ান বলচে, যদি আমরা ষাঁড়াতলার দ'-এর হাবড় পর্য্যন্ত গিয়ে চাকা ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিতে রাজী হই, তবে সে আমাদের গাড়িতে চড়তে দেবে পাকা রাস্তা পর্য্যন্ত।

আমরা সবাই হৈ-হৈ করে গাড়িতে উঠলাম, কতক গাড়ির ছাদে, কতক পেছনে, কতক ভেতরে। ষাঁড়াতলার দ-এর কাদা থেকে সবাই মিলে ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিলাম, তার বদলে পাকা রাস্তা পর্য্যন্ত আমাদের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গেল। কি মজা!

আমরা যখন পাকা রাস্তায়, তখন সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। ননী বল্লে—গা ধোবো কোথায় ? সব্বো অঙ্গে কাদা।

আমাকে বল্লে—মশাল জ্বালবিনে ? চুপ কর্ কে ডাকচে।

সর্ব্বনাশ ! আমার বাবার গলা।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। ঘুটঘুটি অন্ধকার। বাবা আমায় খুঁজতে বেরিয়েচেন। তিনিই ডাকাডাকি করচেন। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরিনি, বাবা ডাকতে বেরিয়েচেন।

ননী বল্লে—আলো দিবিনে গাছে গাছে ?

আর আলো ! আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে। বাবা কাছে এসে পড়েচেন ডাকতে ডাকতে।

আমি উত্তর দিলাম—যা-ই-ই—

এই সন্ধ্যেবেলা সারা গায়ে কাদা মেখে আমি ভূত হয়ে আছি। আপাদমস্তক কাদা। চালাক গাড়োয়ান একটুখানি গাড়িতে চড়বার লোভ দেখিয়ে কাজ গুছিয়ে চলে গিয়েচে। এখন আমায় ঠেকায় কে ?

বাবা এসে আমার কান ধরলেন। বল্লেন—হতভাগা বাঁদর, পড়া নেই শুনো নেই—এত রাত পর্য্যন্ত বাঁদরের দলে মিশে—এ কি ? গায়ে এত কাদা কেন ?

আমি কাঁদো-কাঁদো সুরে বল্লাম—এই গাড়োয়ান বল্লে—আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দাও—বড্ড কাদা—তাই সবাই মিলে—আমি আসতে চাইনি···আমায় ওরা নিয়ে এল—ওই ননী, নিন্তে, শশী—

বলে সাক্ষ্যপ্রমাণের চেষ্টায় সঙ্গীদের দিকে ফিরে চাইতে গিয়ে দেখি জনপ্রাণী সেখানে নেই। কে কোথা দিয়ে সরে পড়েচে এরি মধ্যে।

বাবা বল্লেন—তোমার দোষ নেই ? তোমাকে সবাই নিয়ে গিয়েছিল ? তুমি বুড়ো-দামড়া কিছু জানো না—না ? ঘোড়ার গাড়িতে না চড়লে তোমার—

কথা শেষ না করেই দুড়দাড় মার। চড় ও কিল। বিষম মার। চোখে সর্ষের ফুল।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম বাবার আগে আগে। মা বল্লেন—আচ্ছা, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে ? না কি ? এই ভবসন্ধ্যেবেলায় ছেলেটাকে অমন ভূতোনন্দি মার—ওমা, তা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে না হয় গিয়েইচে একটু, আজ একটা আনন্দের দিন ওদের, তোমার মত বুড়ো তো ওরা নয়—ছি ছি—নে, এদিকে সরে আয়, খুব আমোদ করেচ ! এসো—

সে-রাত্রে পাকাটি জ্বালিয়ে রোশনাই করা আমার দ্বারা আর সম্ভব হয়নি।

এর ত্রিশ বছর পরের কথা।

আমি কলকাতায় চাকরি করি। বর্ষাকাল। মহকুমার স্টেশনে নেমে বাড়ি যাবো, এমন সময় শ্যামাকাকার ছেলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হোল।

শ্যামাকাকা মারা গিয়েচেন আজ দশ-বারো বছর, গ্রাম ছেড়ে তাঁর ছেলেরা আজকাল শহরে বাস করে, শ্যামাকাকার বড় ছেলেটি এখানে চাকরি করে। ওর নাম অরুণ।

অরুণ বল্লে—বাড়ি যাচ্চেন দাদা ? দীপ্তির বিয়ে পরশু। আপনাকে আসতে হবে অবিশ্যি অবিশ্যি। আসুন না একবার আমাদের বাসায়—

গেলাম। দীপ্তি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী মেয়ে। আমায় দেখে খুশী হয়ে এগিয়ে এল। বল্লাম—কোথায় তোর বিয়ে হচ্ছে রে দীপ্তি ?

দীপ্তি মুখভঙ্গি করে বল্লে—আহা-হা !

—তার মানে ?

—তার মানে আপনার মুণ্ড।

—কথার কি যে ছিরি !

—হবে না ছিরি ? আপনার কথার ছিরিই বা কি এমন ?

—বল্ না কোথায় বিয়ে হচ্ছে ?

—ফের ?

—ছাখ্ দীপ্তি, চালাকি যদি করবি—বল্, কথার উত্তর দে—

দীপ্তি আঁচল নাড়তে নাড়তে বল্লে—আহা, যেন জানেন না আর কি !

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—সেখানে নাকি ? সে-ই ?

—হুঁ !

—ভালো। খুশী হোলাম।

—খুশী কিসের ?

—আবার চালাকি করবি দীপা ! হোস্‌নি খুশী তুই ?

—ওরকম বল্লে আমি মরবো আপিং খেয়ে। সত্যি বলচি।

—আচ্ছা যা, আর কিছু বলবো না। এখন একটু চা করে খাওয়াবি, না এমনি চলে যাবো ?

—খাওয়াচ্ছি, ওমা ! ঘোড়ায় জিন দিয়ে যে ! এমন তো কখনো দেখিনি—

—দেখিসনি, দেখলি। নিয়ে আয় চা।

—খাবেন কিছু ?

—তোর খুশী।

একটু পরে চা ও খাবার হাতে দীপ্তি এসে ঢুকে বল্লে—সোমবারে কিন্তু আসতে হবে। আপনাকে থাকতে বলতাম এখানে, কিন্তু বলবো না। বাড়িতে বড্ড ভিড়। আপনার কষ্ট হবে। সোমবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি—

—আচ্ছা।—

—কথা দিলেন ?

—নিশ্চয়। বরযাত্র না কনেযাত্র ?

—দুই-ই। আপনাদের গাঁয়ের যখন বর, তখন বরযাত্র তো হোতেই হবে।

—কনেযাত্র কার অনুরোধে ?

—আমার।

—আচ্ছা আসি—

—ঠিক আসবেন পরশু ?

—ঠিক।

—ঠিক ?

—ঠিক।

দীপ্তি থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল, যখন আমি চলে এসে রাস্তার ওপর উঠেচি।

যার সঙ্গে দীপ্তির বিবাহ, সে আমাদের গ্রামেরই ছেলে বটে কিন্তু তারা পশ্চিমপ্রবাসী। দেশের বাড়িতে জ্ঞাতি-ভাইরা থাকে। এই বিবাহ উপলক্ষে বহুকাল পরে ওরা সবাই দেশে এসেচে, বিয়ের পরই আবার চলে যাবে। গ্রামে আমিও গেলাম অনেকদিন পরে, আমিও গ্রাম ছেড়েছি দশ-পনরো বৎসর। গ্রামে যেতেই ওদের দল এসে আমায় বরযাত্রী হওয়ার নিমন্ত্রণ

করে গেল।

বিবাহের দিন এসে পড়লো।

বিবাহের লগ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারেই।

অন্যান্য বরযাত্রী কতক নৌকোতে, কতক গরুর গাড়িতে রওনা হয়ে কনের বাড়ি চলে গেল। শহর থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসেচে, সেখানেতে বর, বরকর্ত্তা, পুরুত ও আমি যাবো এই স্থির হয়েছে।

বর বল্লে—নিতাইদা, চা খেয়ে নাও, আর বেশি দেরি না হয়, বাবাকে বলো—তুমিই সব গুছিয়ে নাও!

—সে ভাবনা তোমার কেন? যা করবার করচি।

—শোনো একটা কথা। দীপ্তি তোমায় কিছু বলেছিল?

—না।

—বিয়ের বিষয়ে?

—না।

—দেখা হয়নি আসবার দিন?

—না। কেন?

—তাই জিগ্যেস করচি।

সন্ধ্যের অল্পই দেরি আছে, তখন আমরা ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম, গাড়িও ছেড়ে দিলে।

আমাদের পিছনে শাঁক বাজতে লাগলো, হুলু পড়তে লাগলো।

গাড়ি গাঁ ছাড়িয়ে খানিকদূর যেতে না যেতে অন্ধকার নামলো, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়াতলার দ'য়ের কাদায় গিয়ে পড়লো গাড়ি। কিছুতেই আর ওঠে না। ঝাড়া পনরো মিনিট বৃথা চেষ্টার পর গাড়োয়ান বল্লে—বাবু, একটু নামতে হবে। খালি গাড়ি তখন নিয়ে গিয়েছিলাম, এখন বোঝাই গাড়ি যাবে না। আপনারা একটু নামুন—

অগত্যা নামা গেল—কিন্তু তখন গাড়ির চার চাকা যা পুঁতবার পুঁতে গিয়েচে।

ঘোড়াকে চাবুক মারলে কি হবে, গাড়ি নড়ে না।

তখন আমি আর বরকর্ত্তা দুজনে সেই কাদায় নেমে চাকা ঠেলি। কোনো লোক নেই। বরকে বা পুরুতমশায়কে অনুরোধ করা যায় না চাকা ঠেলতে। আমরা দুজন ছাড়া ঠেলবে কে?

দীপ্তির বিয়ের সুলগ্ন উত্তীর্ণ না হয়ে যায়, তার বিয়েতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, প্রাণপণে ঠেলতে লাগলুম সেই চাকা, সেই ষাঁড়াতলার হাবড়ের মধ্যে। আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হোল। বরকর্ত্তা বুড়োমানুষ, তাঁকে আমি বেশি ঠেলতে দিলাম না। নিজেই ঠেলে কাদা পার করে তুললাম।

বর বল্লে—এঃ, তোমার এ কি চেহারা হোল? কাদায় যে—

আমি বল্লাম—তোমরা যাও, আমি যাচ্চিনে—

সবাই বলে উঠলো—সে কি? সে কি? সে কি হয় নাকি?

—আচ্ছা, এগোন আপনারা। পেছনে আসচি। জামাকাপড় ছেড়ে আসি—

গাড়ি চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেদিকে চেয়ে। আর আমি যাবো না। দীপ্তির বিয়ে সুলগ্নে হোক, বাধাশূন্য হোক।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো একদিনের কথা। দীপ্তির বাবা বিয়ে করে যেদিন ওর মাকে নিয়ে ফিরছিলেন। ত্রিশ বছর আগের ঠিক এমনি এক অন্ধকার সন্ধ্যা।

সেই শ্রাবণ মাসে ষাঁড়াতলা দ'এর কাদা ঠেলে গাড়ি উঠিয়েছিলাম কাদায় মাখামাখি হয়ে। বাবার কাছে মার খেয়েছিলাম।

আজ আবার তাদেরই মেয়ের বিয়েতে সেই রকমই গাড়ি ঠেলচি, গাড়িও যাচ্চে শহরের দিকেই। তাঁদেরই মেয়ে দীপ্তি। হয়তো সে আজ খুব রাগ করবে আমি না—

জীবনে কি আশ্চর্য্য ঘটনাই সব ঘটে!

ভৌতিক পালঙ্ক

অনেকদিন পর সতীশের সঙ্গে দেখা। বেচারা হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে বিকালবেলা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথ দিয়ে উত্তরমুখে চলেছিল। সমস্ত আপিসের সবেমাত্র ছুটি হয়েছে। শীতকাল। আধ-অন্ধকার আধ-আলোয় পথ ছেয়ে ছিল। ক্লান্তদেহে ছ্যাকড়া-গাড়ির মত ধীরে ধীরে পথ ভেদ করে চলেছিলাম। সহসা সতীশের জামাটা চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলাম—আরে, সতীশ যে!

সতীশ সবিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে বলে উঠল—খগেন! বাই গড্! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বললাম—তার প্রমাণ, আমাকে ধাক্কা দিয়েই তুমি চলে গেছলে আর একটু হলে! ভাগ্যিস্ ডাকলাম!

—সরি। আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তা কোথায় চলেছ শুনি?

—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বেশীদূর নয়। যাবার পথে সব বলব।

—আশ্চর্য্য!

—'না' বল্লে শুনব না। জোর করে নিয়ে যাব।

ছেলেবেলা থেকেই সতীশকে চিনি। কথা অনুযায়ী সে কাজ করে। আর শরীরে কিছু বল থাকায়, প্রায়ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগ করে স্বার্থসিদ্ধি করতে ভোলে না। অগত্যা তার সঙ্গে যেতে হোল।

তার গন্তব্যস্থান খুব নিকটেই ছিল এবং সে তার উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপেই ব্যক্ত করল। সেদিন সকালে খবরের কাগজে বেচা-কেনার কলমে একটি বিজ্ঞাপন ছিল:

"একটি অতি আধুনিক এবং রহস্যজনক চীনদেশীয়
খাট অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রয় করা হইবে।
জগতে ইহা অদ্বিতীয়। সুযোগ হারাইলে
অনুশোচনা করিতে হইবে।
২।৩.....স্ট্রীট।"

সতীশ তার পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটি বার করে বল্ল—পড়।

—বুঝলাম। তা 'রহস্যজনক' শব্দটার মানে কি?

—ঐটেই তো আমায় ভাবিয়ে তুলেচে! কোনো হদিস করে উঠতে পারছি না।

সতীশ চলছিল রাস্তার নাম দেখতে দেখতে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল—পেয়েছি। এই গলি।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই গলির পানে তাকিয়ে আমার সারা শরীর—কেন জানি না—একপ্রকার শিহরণ জাগল। চীনাপল্লীর চীনা-আবহাওয়ায় রহস্যজনক খাট! সতীশের হাতটা ধরে বললাম—খাটে কাজ নেই সতীশ, চল ফিরে যাই। আমার বাঙালী-খাট বেঁচে থাকুক।

সতীশ প্রবলবেগে এক ঝাঁকানি দিয়ে উঠল—ভীতু কোথাকার! এতটা এগিয়ে এসে কখনও ফেরা যাবে না।

গলির মোড়ে ডান পাশে একটা নিমগাছ ভূতের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে যত সব অখাদ্য-কুখাদ্যের উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে। অন্নপ্রাশনের ভাত যেন ঠিক্‌রে বার হয়ে আসতে চাইল অসহ্য যন্ত্রণায়! নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনগতিকে পথ চলতে লাগলাম।

একটা দমকা বাতাস বিভ্রান্ত হয়ে আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে এসে আমাদের শরীরে যেন আছাড় খেয়ে পড়লো। মাথার উপর দিকে কয়েকটা বাদুড় ডানার শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। দুটো অভিভাবকহীন কুকুর এই অনধিকার প্রবেশকারীদের পানে চেয়ে বিশ্রী সুরে অভিযোগ করতে লাগল।

পথে আর জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। পাশে একটি চীনা-ডাক্তারের বহু পুরাতন সাইন-বোর্ড। তার উপরকার নরকঙ্কালের ছবিটি জীর্ণপ্রায়। কোথা থেকে একটি পিয়ানোর অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছিল।

শীঘ্রই আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে এসে পৌঁছোলাম। অমন বাড়ি আমি আর জীবনে দেখিনি। ইট বার-করা পঙ্গুপ্রায় বহু প্রাচীনকালের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে এই বাড়ির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।

ভাঙা ফটক দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। এত লোক এখানে কোথা থেকে এল? যে নির্জ্জন নিস্তব্ধ গলি আমরা পিছু ফেলে আসলাম, সেখানে তো কারুর ছায়া পর্য্যন্ত খুঁজে পাইনি! ভৌতিক কাণ্ড নাকি? সকলের মুখেই কৌতূহলের ছাপ বর্ত্তমান। নানা জাতির লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। এতগুলি লোক, কিন্তু কারুর মুখে একটি কথা নেই। ছুঁচ পড়লে পর্য্যন্ত তার শব্দ শোনা যায়।

ঘণ্টাখানেক পর একটি বৃদ্ধ মোটা চীনা আমাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেল। তার মাথার একটি চুলও কাঁচা ছিল না। তার সামনের ওপরের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, আর বাঁ হাতের উল্কিতে একটি ভোজালির ছবি। সে আমাদের ইশারা করে অনেকগুলি ঘর পার করে সেই খাটের ঘরে নিয়ে গেল। বাড়িটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত—চারিদিকে গোলকধাঁধা।

হ্যাঁ, খাট বটে! অমন খাট আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। খাট আমি অনেক দেখেছি; কিন্তু ঠিক ঐ রকম আশ্চর্য্য চীনা-খাট সেই প্রথম এবং শেষ দেখলাম। তার অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য! একপাশে ভগবান বুদ্ধের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি। আয়তনে খাটটি বিশেষ বড় নয়। দুটি মানুষ বেশ আরামে শুতে পারে। আবার আশ্চর্য্য, সেই খাট বাড়িয়ে, দশজনের জায়গা করা যায়! দেখে চমকে গেলাম। সকলের সঙ্গে দর-কষাকষি হতে লাগল। ঐ সামান্য একটা কাঠের খাটের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়েছিল। কেনবার জন্যে সকলের কি সে ব্যাকুলতা! দাম হু-হু করে বাড়তে লাগল। শেষে সতীশের ভাগ্যেই ঐ খাটটি জুটল—পনরো-শ টাকায়।

সেই খাট নিয়ে বাড়ি ফিরতে সতীশের প্রায় দশটা বাজল। যে দেখল সে-ই বল্ল—চমৎকার!

সেখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে আমি বাড়ি গেলাম। সতীশ বল্ল—আবার এস, নেমন্তন্ন রইল।

—তথাস্তু। বলে চলে এলাম।

আমি যাবার আগেই পরের দিন সকালে সতীশ এসে হাজির। উস্কখুস্ক চুল, মুখ শুকনো। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় হয়তো সারারাত্রি ঘুম হয়নি!

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করতাম—আরে, ব্যাপার কি?

—বিপদ, বিষম বিপদ! সতীশের গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না।

—কিসের বিপদ?

—সেই খাট!

একটা যে কিছু হবে, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কেউ কখনও খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসে? হাজার হোক, ওটা একটা রহস্যজনক খাট।

পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। সারারাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। ঐ খাটের ওপর সে শুয়ে ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তার মনে হোল, কে যেন খাটটা নাড়াচ্ছে! উঠে সুইচ টিপে আলো জেলে দেখল, না, খাট ঠিকই আছে। আবার শুয়ে পড়ল—আর খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল। কিসের একটা ভীষণ শব্দে সারা ঘরখানা যেন গমগম করছে! দেওয়ালের সঙ্গে যেন খাটখানার ভীষণ ঠোকাঠুকি হচ্ছে!

ধড়মড় করে উঠে ও আলো জ্বালল। না, সব কিছু নিঃশব্দ নিথর—কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। সে আবার শুয়ে পড়ল। এবার আর সে আলো নেবাল না। ভোররাত্রে কার দুর্ব্বোধ্য আর্ত্তকণ্ঠের বিলাপধ্বনিতে তার চেতনা ফিরে এল। কে যেন খাটের পাশে বসে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছিল।

আমি বল্লাম—বলেছিলাম তো তোমায় প্রথমেই, ও খাট কিনে কাজ নেই। যেমন তোমার রোখ্। এইবার বোঝো।

সতীশ বল্ল—দেখ খগেন, তোমায় হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। ঐ হতভাগা খাটখানার ওপর এমন মায়া লেগে গেছে যে কি বলব! আমি ওকে ছাড়তে পারব না কোনমতেই।

—তবে মর ঐ খাট নিয়ে।

—আমি তোমার সাহায্য চাই।

—আমার সাহায্য!

—হ্যাঁ, আজ তুমি আমাদের ওখানে রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারারাত না ঘুমিয়ে ঐ খাট পাহারা দেব। দেখি, ওর গলদ কোথায়!

—আর আমার আপিস?

—পাগল, কাল যে রবিবার!

অগত্যা বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। সতীশ আমার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে ছিল। সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল—সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!

—তারপর? আর কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?

—না, দিনের বেলা গণ্ডগোল হবার তো কোন কারণ নেই!

সতীশের মা বল্লেন—দেখ দেখি বাবা খগেন, এত বলছি—যা, বিক্রি করে দে,—তা আমার কথা যদি ও শুনেচে!

সতীশ বল্ল—বলছ কি মা, ভয় পেয়ে পনরো-শ টাকার খাটটা বিক্রি করব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি জাগবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে খাটের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে দীনেন রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, আর সতীশের হাতে "হেলথ্ অ্যাণ্ড হাইজিন"।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। ঠিক হোল, আগে সতীশ ঘুমুবে আর আমি জাগব। তারপর সতীশ জাগবে, আর আমি ঘুমুব।

বইখানা খুলে আমি বসে রইলাম। পড়তে পারলাম না একটি অক্ষরও, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম; চারদিকে কান খাড়া করে বসে রইলাম ভয়ে ভয়ে। এতটুকু শব্দে থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম। ঐ বুঝি অপদেবতা আমার গলাটি দিলে টিপে!

কাদের বাড়ির ঘড়িতে সুর করে দুটো বেজে গেল। হঠাৎ মনে হোল, কে যেন বাইরের বারান্দায় চলে বেড়াচ্ছে! তার পদশব্দ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল, লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সশব্দে খোলা জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে বোধ হোল, আমি যেন শূন্যে উঠে গেছি, আমার জ্ঞান যেন লোপ পেয়ে গেছে। আমি মৃত না জীবিত, তাও ঘোর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। আমি সভয়ে ডেকে উঠলাম—সতীশ! সতীশ!

সতীশ ধড়মড় করে উঠে বসল—ব্যাপার কি খগেন? ব্যাপার কি?

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। সতীশ আমার দু' কাঁধে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—খগেন! খগেন!

আমি আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বল্লাম—ওঃ! যা ভয় পেয়েছিলাম!

—তা তো বুঝতেই পারছি। যাক্, আর তোমায় জাগতে হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি জেগে বসে আছি।

—না, আমারও ঘুমিয়ে কাজ নেই। আর তা ছাড়া ঘুমও আমার হবে না আদৌ।

—ভীতু কোথাকার!

তারপর ভীতু আমি ও সতীশ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে রইলাম। আমরা দু'জনেই নিঃশব্দে জেগে রইলাম। কেউই একটিও কথা কইলাম না। আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের টুকরো আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। অসংখ্য তারকা মিটমিট করে জ্বলছিল। বোধ হোল, তারা যেন আমাদের বিপদে ফিক-ফিক হাসছে! আমরা চুপটি করে বসে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিকের আলো দপ্ করে নিবে গেল। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—কে?

বোধ হোল কে যেন যেন সুইচ্ বন্ধ করে দিয়েছে!

হঠাৎ এক উৎকট হাসিতে সারা ঘর ভরে উঠল। অমন হাসি আমি জীবনে কাউকে হাসতে দেখিনি। হাসি যেন আর শেষ হতে চায় না! সে কি বিকট শব্দ!—হা-হা-হা-হি-হি-হি-হো-হো-হো-হে-হে হে···

বোধ হোল, কে যেন ঠিক দরজার কাছে হেসে খুন হচ্ছে! আমি শিউরে উঠলাম।

সতীশ চট করে টর্চটা দরজার ওপর ফেলল। তাতে হিতে বিপরীত হোল। বোধ হোল কে যেন দরজার ঠিক বিপরীত দিকে জানলাটার ধারে বসে আর্তকণ্ঠে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছে!

তার কান্নার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। কেবল একটা করুণ সুর সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। তার পর সেই খাটের উপর গিয়ে সেই বিলাপ-ধ্বনি আর নড়ল না। তার কান্নায় যেন খাটটা ভিজে গেল। সেই অবোধ্য ভাষার সকরুণ বিলাপ-ধ্বনি চিত্তে এমন এক অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করল, যার ফলে আমাদের সমস্ত শক্তি যেন ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। মনে হোল, কে যেন ক্লোরোফর্ম্ দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে দিচ্ছে! আমরা যেন ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছি!

সতীশের সাহসটা ছিল কিছু বেশী, তাই সে খাটের উপর টর্চ্চ ফেলে গর্জ্জে উঠল—কে, কে ওখানে?

কিছুই দেখা গেল না, কেউ সাড়া দিল না। সহসা সেই খাটখানা ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হোল অগণিত নরকঙ্কাল যেন তার চারিদিকে নৃত্য করচে। তাদের হাড়ের খটখট শব্দে কানের পর্দ্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হোল। আমার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল কিসের যেন বেদনায়। বোধ হোল, হয়তো বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

একটু একটু করে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হোল, আমি যেন অনেক দূরে এক চীনাবাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছি। একটি ছোট ঘরে তখন সেই গভীর রাতে টিম-টিম করে একটি দীপ জ্বলছিল। ঘরের মেঝের উপর একটি লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েচে।

একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর তার সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা দেখে আমার বড় দয়া হোল। রোগে ভুগে ভুগে বেচারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তার পাশে বসেছিল—তার স্ত্রী হবে বলেই বোধ হোল—চেহারা কিন্তু তার স্বামীর চারগুণ। একটা মস্ত টুলের ওপর বসে সে ঢুলছিল।

তার পাশেই আমাদের এই খাটটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাত সমুদ্র তের নদী পার করে এটাকে কে এখানে নিয়ে এল?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি বিকট এক হাঁ করে হাই তুলল, তারপর দুটো সশব্দ তুড়ি দিয়ে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল। দেখলাম—তার স্বামী ইতিমধ্যে উঠে সেই খাটের দিকে এগিয়ে গেছে চুপি চুপি। চকিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত তার স্ত্রী তাকে জোর করে খাট থেকে নামিয়ে বিছানায় ফেলে দিলে। সে ভীষণ ভাবে গর্জ্জন করতে লাগল, আর তার স্বামী ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতে লাগল, ঐ খাটের পানে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করে!—বোধ হল, সে চায় খাটে উঠতে; কিন্তু তার স্ত্রী তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না।

উত্তেজনায় কাশতে কাশতে তার মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে গেল। আমি শিউরে উঠলাম। তারপর লোকটার মাথাটা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, আর সে উঠল না। তার স্ত্রী তার পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম—ভোরের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। দেখলাম—সতীশের মা আমার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন।

তিনি আমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে বল্লেন—খগেন, বাবা খগেন!

আমি বল্লাম—আমি কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—সতীশ কোথায়?

—সতীশের এখনও জ্ঞান হয়নি।

তারপর শুনলাম—রাত্রি চারটে নাগাদ আমরা নাকি দুজনে সদর দরজায় এসে মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ-গোঁ করতে থাকি। সতীশের মা বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দেন। পাকা তিন ঘণ্টা তদারক করার পর আমাদের জ্ঞান হয়। ডাক্তার এসে বলে গেছিল—ভয়ের কোন কারণ নেই। একটা 'সাড্‌ন্ শক্' (sudden shock) আর কি! জ্ঞান হলে একটু ব্রোমাইড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীশের জ্ঞান হতে, সেও সেই আমারই মত অবিকল উদ্ভট স্বরে কথা বলে গেল। আমি বিস্ময়ে সকলের পানে তাকিয়ে রইলাম।

সতীশের মা বল্লেন—আগে ঐ সর্ব্বনেশে খাট বিদায় কর বাবা!

খাট-বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল। পরের দিন বিকালে অসংখ্য লোকে বাড়ি ছেয়ে গেল। খাটটা বিক্রি হোল—শেষ পর্য্যন্ত দু'হাজার টাকায়। এক ইহুদী সেটা কিনে নিয়ে গেল।

যাক, মাঝ থেকে কিছু লাভ হোল। বিক্রি না হলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো ওটা বিলিয়ে দিতে হোত।

এখনও মাঝে মাঝে সেই রহস্যজনক খাটের কথা ভাবি। এক-একবার মনে হয়—সেটা এখন কার কাছে আছে, খোঁজ করি। সেই অতৃপ্ত আত্মা—যাকে তার দুর্দ্দান্ত স্ত্রী কোন ক্রমেই ব্যাধির ভয়ে খাটের ওপর জীবিত অবস্থায় শুতে দেয়নি, সে কি আজ তৃপ্ত হয়েছে? না, এখনও সে ঐ খাটের পিছনে প্রতি রাত্রে ঘুরে ঘুরে মরে—কাউকে ওর ওপর শুতে দেবে না বলে?